বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে জন-জীবন ঃ একটি সমীক্ষা

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
তত্ত্বাবধায়ক
পালি এণ্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফারিয়া আফরিন
পি এইচ ডি গবেষক
রেজি নং-৬৪
শিক্ষা বর্ষ ঃ ২০১১-২০১২
পালি এণ্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ঃ
১২মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে জন-জীবন ঃ একটি সমীক্ষা

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
তত্ত্বাবধায়ক
পালি এণ্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফারিয়া আফরিন
পি এইচ ডি গবেষক
রেজি নং-৬৪
শিক্ষা বর্ষ ঃ ২০১১-২০১২
পালি এণ্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ঃ
১৫মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে জন-জীবনঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি আমার জন্য খুবই দূরূহ ব্যপার ছিল। এই গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি অনেকের নিকট ঋণী। বিশেষ করে আমার প্রিয় শিক্ষক এবং গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট বৌদ্ধতত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়ার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করার জন্য আমাকে যেভাবে পরামর্শ, উপদেশ ও তাগিদ দিয়েছেন তা কখনো ভূলার মত নয়। তিনি না হলে আমার এ গবেষণা কর্ম শেষ করা কখনো সম্ভবপর হতো না।

মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আমার থিসিস জমা দেওয়ার সময় বৃদ্ধিকরণের জন্য। এছাড়া পিএইচ ডি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তারা নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

এ ছাড়া বিভাগের অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকগণও নানা ভাবে আমাকে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন- অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুমনকান্তি বড়ুয়া, মিসেস নীরু বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া প্রমুখ শিক্ষকগণ। এজন্য তাঁদেরকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানাই। আমার আম্মু নার্গিস আক্তার এবং আব্বু আবু বকর বিশ্বাস উভয় আমার উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকর্মে আমাকে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। আমার স্বামী ব্যারিষ্টার আনোয়ারুল ইসলাম শাহিন দিন-রাত পরিশ্রম করে যেভাবে আমার থিসিস দেয়ার কাজে সহযোগিতা করেছে তা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কখনো ঋণ শোধ করা যাবে না। আমার বড় ভাইয়া সাজ্জাদ হায়দার (সুমন) ও ছোট ভাইয়া জুলফিকার হায়দার (নয়ন) উচ্চশিক্ষাসহ এই গবেষণাকর্মে বিশেষ করে থিসিস কম্পোজের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছে। আমার খালুজান মরহুম হাসান শাহারিয়ার জাহেদী (রাহুল) এবং জাহেদী মামা জনাব নাসের শাহারিয়ার জাহেদী (মহুল) আমার উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে অতীব আনন্দিত এবং সব সময় খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন, নানাভাবে সহোযোগিতা প্রদান করেছেন। এছাড়া আমার শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি শেফালী খাতুনসহ আমার

Dhaka University Institutional Repository

স্বজন পরিজন ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমার উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণাকর্মের ব্যাপারে খুবই আগ্রহান্বিত ও প্রীত ছিলেন। তাঁদের সকলের আর্শিবাদ ও শুভেচ্ছায় আমার আজ এতটুকু অর্জন হয়েছে এবং পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভের প্রত্যাশা করছি। তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এছাড়া আমার এই গবেষণাকর্মের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বিভিন্ন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানদেরকে। তাঁরা সাহায্য না করলে আমার গবেষণাকর্মের মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত ও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স সংগ্রহ করা কখনো সম্ভবপর হতো না। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমী, পাবলিক লাইব্রেরিসহ বিভাগীয় সেমিনারে নানা বই-পুস্তক ও জার্নাল প্রভৃতি আমাকে উপকৃত করেছে। বিভাগীয় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এজন্য আমি তাদের নিকটও কৃতজ্ঞ। সর্বশেষ আমার থিসিস কম্পোজ করার কাজে আমাকে যারা সাহায্য করেছে তাদের কথা না বললেই নয়। প্রথমে আমি সাহায্য পাই আনাজুল হকের কাছে। এরপর মেহেদী এবং সর্বশেষ শফিক আমার কাজটি শেষ করে দিয়েছে। তাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষ একটি বাক্য লিখে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার শেষ করতে চাই। সেটি হলো আমার মেয়ে সুমেহ্‌রা রাবাব দ্যুতির কথা। আমার এই গবেষণাকর্ম করতে গিয়ে তাকে যথাযথ আদর-মমতা থেকে আমি বঞ্চিত করেছি যা আমার জন্য ছিল অতীব কষ্টকর। বাধ্য হয়ে করেছি। এজন্য আমি তাকে জানাই আমার পরম মমতা পরম শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক আদর। আমি তার নিকট বেশি ঋণী। আশাকরি আমার এ গবেষণাকর্ম সুধি পাঠক সমাজের জন্য একটি উপাদেয় গ্রন্থ হবে। আমার শ্রম তখনই সার্থক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জাতক পালি ত্রিপিটকের খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। পালি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথ্যসমৃদ্ধ এবং উপাদেয়। এটি শুধুমাত্র বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। জাতকের গল্পগুলোতে প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনীগুলো জাতকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এর সংখ্যা হলো ৫৫০। এ সকল জাতক কাহিনীতে প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু মূল্যবান তথ্য, বিশেষ করে তৎকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি সে সময়কার নানা পেশা ও জীবন-জীবিকার বিচিত্র ইতিহাস ও উপাদানে এ জাতক সাহিত্য ভরপুর।

বলতে গেলে, প্রাচীন সমাজের বৈচিত্র্যময় জন-জীবন এবং তাদের জীবন-জীবিকার তথ্য সংগ্রহ করাই হলো এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্যে। প্রাচীন জন-জীবন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করা এবং এর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আমাদের জন-জীবনের নানা পেশা ও জীবন-জীবিকার সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা এই গবেষণার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যে। এছাড়া সে সময়কার নর-নারীদের অবস্থান ও জীবন-জীবিকার একটি সঠিক প্রতিবেদন এবং শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, শিক্ষা, কৃষ্টি-ঐতিহ্য ও পুরাতত্ত্বের নানান কাহিনী এবং কীর্তিগুলো সংগ্রহ করা এবং এগুলোর মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকার বহুমাত্রিক জ্ঞান, মেধা ও ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ করে জাতকের আলোকে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লিপিবদ্ধ করাই আমার পি এইচ ডি গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্যে।

আমরা এও জানি, পালি ত্রিপিটক হলো-বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং বুদ্ধ সমকালীন ধর্মতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য, কলা, পুরাতত্ত্ব, কৃষ্টি সংস্কৃতির এক অমূল্য আকর। সে হিসেবে জাতক সাহিত্যও প্রাচীন ভারতের সামাজিক জন-জীবন, পেশা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য জানার এক অমূল্য ভাণ্ডার। অতএব জাতক সাহিত্যের আলোকে এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে প্রচুর গবেষণা হলেও বাংলাদেশে বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যের আলোকে জন-জীবন ও তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও

Dhaka University Institutional Repository

পেশা সম্পর্কিত তেমন কোন গবেষণা হয়নি বলা চলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটি নতুন গবেষণাকর্ম যেখানে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এ কাজটি করেছি। এতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আবিস্কৃত হবে যেটি আমাদের জন-জীবন ও সমাজ বিনির্মাণে অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। সেদিক থেকে বিচার করলে আমার এ গবেষণা কর্মটি হবে দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক ও সুধি পাঠক সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী সহায়ক ভাণ্ডার।

ঐ আলোকেই আমার এ গবেষণাকর্মকে আমি পঞ্চম অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সাজিয়েছি। নিম্নে অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলোঃ

প্রথম অধ্যায়ে জাতক পরিচিতির মধ্যে জাতকের পরিচয়, জাতকের গঠন প্রকৃতি, জাতকের রচয়িতা ও রচনাকাল, সংগ্রহকাল, গাথা, বর্গ, নাম এবং জাতকের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, জাতক একটি ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য বহুল এবং অন্যতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়া জাতকের উৎস অর্থাৎ এটি কোথায়, কখন কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভব হয়েছে তার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই সামগ্রিক আলোচনা সাপেক্ষে এ অধ্যায়ে জাতকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বিষয়াদি পাওয়া যায়, তেমনিভাবে গ্রাম, নগর, জনপথ সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে জাতক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য পালি, বৌদ্ধ সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্য উপস্থাপন পূর্বক জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের অনেক গ্রাম, দেশ, নগর ও জনপদের নাম পাওয়া যায় যা অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নগর সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকে ১৪৯ টির মতো নগর আছে। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় ও জাতক গ্রন্থে ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে দেখা যায়, প্রধান প্রধান জনপদ এবং নগরসমূহ উত্তর ভারতে অবস্থিত ছিল। এসব গ্রাম ও জনপদকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-সভ্যতা এবং রাজনীতি আবর্তিত হতো। এসব নগর ও জনপদে নানা শ্রেণি-

Dhaka University Institutional Repository

পেশার লোক বসবাস করতো। অতএব বলা যায় প্রাচীনকালের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ঐ ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালের রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো বিকাশ লাভ করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের নর-নারীদের জন-জীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এতদসঙ্গে সে সময়কার নারী-পুরুষের জীবন এবং বিবাহ প্রথার নানা তথ্য-ইতিহাসের বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীনযুগে রাজকুলের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা ছিল। এ সকল প্রথা ও কতিপয় বিবাহের ঘটনাসহ বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ নানা বিবাহ বর্ণনা এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে পুরুষরাই শুধুমাত্র যে, সিংহাসন লাভ করতেন তা নয়; নারীরাও সিংহাসন লাভ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। পুরুষদের মতো নারীদেরও একাধিক পতিগ্রহণের কথা জানা যায়। সে সময়কার নর-নারীরা ঘর-সংসার, বিপুল ঐশ্বর্য, ধন, সম্পদ-প্রভৃতি ত্যাগ করে ধর্মীয় জীবন যাপন করতেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয় শিল্প বিদ্যা ও শিক্ষা সম্পর্কেও তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ অধ্যায়ে এসব বিষয়ে অবতারণা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও পশুপাখি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত জাতক সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পশুপাখি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের সঙ্গে পালি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করে এ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পশুপাখি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। বিষেশ করে জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জাতক গ্রন্থসহ অন্যান্য বৌদ্ধ সাহিত্য ও পালি গ্রন্থে সে সময়কার ভারতবর্ষের প্রচুর পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, সাগর, জলাশয় প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন পশু, পাখি, বৃক্ষ ও ঋতুর নামোল্লেখও আছে। এমনকি সিদ্ধার্থ গৌতম ও বুদ্ধ জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশ রয়েছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে বুদ্ধের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় যেমন শশ্মান, অরণ্যে, নদীর তীরে, হিমালয়ে, বৃক্ষমূলে অর্থাৎ অরণ্যচারী হয়ে বসবাস করেছেন। ধ্যান-সমাধি করেছেন। ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধতায় জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। বলতে গেলে জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত রাজকুমার সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধ জীবনের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশ অবিচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ে জাতকে প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য বিচার বিশ্লেষণে এ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। নানা ধর্মমত ও ধর্মদর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নানা জাত-পাত ও ধর্ম বর্ণের যে অবস্থা ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। জাতক সাহিত্যে এর নানা বর্ণনা আছে। সে সময়ে একই সমাজে উচ্চ ও নিচু বর্ণের মানুষ এবং দাস-দাসী বসবাস করতো। তাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য ছিল। নানা জনপদে বড় বড় প্রাসাদ ও শ্রেষ্ঠীও ছিল। শ্রেষ্ঠীরা প্রাসাদে বসবাস করতেন এবং দাস-দাসী কিংবা চণ্ডালরা সমাজের নিম্নস্থানে নিম্ন জায়গায় বসবাস করতো। এখনো এগুলো বিলুপ্ত হয়নি। বর্তমানেও এগুলো প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনকালে বহু ধর্মীয় অনুশাসন, অনুশাসকও ছিল যা বর্তমানকালেও দেখা যায়। শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমানকালের মতো বিভিন্ন স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলেও গুরুগৃহে সবাই শিক্ষা লাভ করতেন। সে সময়ে সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানকালের মতো সে সময়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা, আবৃত্তি, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এছাড়া সামাজিক রীতিনীতিও প্রচলিত ছিল।

অর্থাৎ এ অধ্যায়ে জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক এবং প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেই আলোকে পঞ্চম অধ্যায় তুলনামূলক বৃহৎ হয়েছে বলা চলে।

পরিশেষে একটি উপসংহার প্রদান করা হয়েছে যেখানে এ গবেষণাকর্মে আমার নিজস্ব মত উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ মূল্যবান একটি গ্রন্থপঞ্জির তালিকা দিয়েই আমার অভিসন্দর্ভটি পরিসমাপ্তি করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

“বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে জন জীবন ঃ একটি সমীক্ষা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

জাতক পালি ত্রিপিটকের খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। পালি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথ্য সমৃদ্ধ এবং উপাদেয় একটি গ্রন্থ। এটি শুধুমাত্র বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। জাতকের গল্পগুলোতে প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনীগুলো জাতকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এর সংখ্যা হল ৫৫০। এ সকল জাতক কাহিনীতে প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু মূল্যবান তথ্য, বিশেষ করে তৎকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি সে সময়কার সমাজ-জীবনের নানা পেশা ও জীবন-জীবিকার বিচিত্র ইতিহাস ও উপাদানে এ জাতক সাহিত্য ভরপুর।

‘বোধি’ শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং ‘সত্ত্ব’ মানে হল জীব বা প্রাণি। সুতরাং বোধিসত্ত্ব বলতে এমন প্রাণিকে বোঝায় যার মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। বোধিসত্ত্ব কিন্তু বুদ্ধ নন। তবে ভবিষ্যতে কোন এক সময় তিনি বুদ্ধ হবেন, এটা নিশ্চিত। তাই তিনি ভাবী বুদ্ধ।

ভবিষ্যতে যিনি বুদ্ধ হবেন তিনিই বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন জীবকুলে বোধিসত্ত্বরূপে তাঁকে জন্ম নিতে হয় অসংখ্যবার। পূরণ করতে হয় দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী। বুদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে জন্ম-জন্মান্তরে বহুবিধ কুশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা অশেষ পুর্ণ্যফল অর্জন করতে হয়। এর প্রভাবে পারমী পূরণ এবং বুদ্ধত্বে উত্তরণই বোধিসত্ত্ব জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে জাতক নিদান নামে একটি গ্রন্থ আছে। এ গ্রন্থের তিনটি অংশ দূর নিদান, অবিদূর নিদান এবং সন্তিক নিদান। দূর নিদানে বর্ণিত সুমেধ তাপসের গৌতম বুদ্ধরূপে আবির্ভাবের চমৎকার কাহিনীটি এখানে তুলে ধরা হল-

আজ থেকে লক্ষকল্প অর্থ্যাৎ অসংখ্য বছর পূর্বে পৃথিবীতে অবর্তীণ হয়েছিলেন দীপংকর সম্যকসম্বুদ্ধ। সে সময় অমরাবতী নগরে বাস করতেন সুমেধ নামে এক তাপস।

Dhaka University Institutional Repository

একদা অমরাবতীবাসীরা দীপংকর বুদ্ধকে তাঁদের নগরে আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যথাসময়ে দীপংকর বুদ্ধ তাঁর পাঁচশত শিষ্য নিয়ে অমরাবতী অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। প্রচুর বর্ষণে রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল। নগরবাসীরা রাস্তা সংস্কারের কাজে লেগে গেলেন। দীপংকর বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনে সুমেধ তাপসও তাদের সাথে এসে রাস্তা সংস্কারের কাজে যোগ দিলেন।

রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। মাত্র দু-তিন হাত পরিমাণ রাস্তা অসমাপ্ত। এদিকে দীপংকর বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ঠিক সেই অসমাপ্ত রাস্তার নিকট এসে উপস্থিত। ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন গ্রামবাসীরা। অসমাপ্ত রাস্তার কাজ করছিলেন সুমেধ তাপস। তিনি ভাবলেন- কাদা মাড়িয়ে এই সামান্য রাস্তা পার হবেন দীপংকর বুদ্ধ! না, তা হতে পারে না। তিনি আর কালক্ষেপণ করলেন না। হাতিয়ার রেখে দিয়ে নিজেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন সেই কাদাপূর্ণ রাস্তায়। শায়িত অবস্থায় করজোড়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে দীপংকর বুদ্ধকে তাঁর দেহের উপর দিয়ে অতিক্রম করার অনুরোধ জানালেন। দীপংকর বুদ্ধও স্থির করলেন-তিনি সুমেধ তাপসের অনুরোধ রক্ষা করবেন। ভাঙ্গা রাস্তা, রাস্তা পার হওয়ার জন্য তিনি সুমেধ তাপসের দেহে পা রাখলেন। ঠিক সে সময় সুমেধ তাপস মনে মনে সংকল্প করলেন- "আমি যেন ভবিষ্যতে দীপংকর বুদ্ধের ন্যায় সম্যক সম্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে আবিভূত হতে পারি"।

দীপংকর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি ওই শায়িত তাপসের মধ্যে ভাবী বুদ্ধের সকল প্রকার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলেন। সুমেধ তাপসের দিকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন 'তাপস' তোমার সংকল্প পূর্ণ হোক।

এর পর থেকে সেই সুমেধ তাপসের শুরু হল বোধিসত্ত্ব জীবন। জন্ম-জন্মান্তর পাড়ি দিয়ে কুশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা পূর্ণ করলেন সকল প্রকার পারমী। এই সুমেধ তাপসই রাজা শুদ্ধোদন ও রানী মহামায়ার ঘরে সিদ্ধার্থরূপে সর্বশেষ জন্ম পরিগ্রহ করেন। ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বোধি লাভ করে তিনি হন বুদ্ধ, গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ।

সিদ্ধার্থ জন্মের পূর্বে তিনি যে বোধিসত্ত্ব হিসেবে বহুবার বিভিন্ন প্রাণিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার বিবরণ জাতকের কাহিনীগুলোতে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদের বিশ্বাস তিনি এর পূর্বে আরও ৫৪৯ বার

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম হিসাবে এটি তাঁর ৫৫০ তম বা সর্বশেষ জন্ম। পারমী পূরণই ছিল এসব জন্মের প্রধান কারণ।

তিনি যে শুধু মানবকুলে জন্ম নিয়েছিলেন তা নয়, অন্য প্রাণিকুলেও তিনি জন্মগ্রহণ করেছিন বহুবার। বানরিন্দ্র জাতকে তাঁকে বানররূপে জন্মগ্রহণ করতেও দেখা যায়। বাবেরু জাতকে ময়ূর এবং কপোত জাতকে কপোত হিসেবেও জন্মগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ, শুদ্র, চণ্ডাল, পশু, পাখি এমন কোন কুল নেই যেখানে বোধিসত্ত্ব জন্মগহণ করেন নি। জাতকে বর্ণিত সিদ্ধার্থ গৌতমের এসব পূর্বজন্ম বৃত্তান্তকে আবিদূর নিদান বলা হয়।

অন্যদিকে বুদ্ধের দর্শন এবং মতবাদ নিয়ে পালি সাহিতা, রচিত হয়েছে। পালি সাহিত্যের দুটি অংশ আছে। একটি হল মূল পালি ত্রিপিটক এবং অপরটি হল অট্ঠকথা বা অর্থকথা সাহিত্য। ত্রিপিটক বুদ্ধবচন। বুদ্ধবচন গম্ভীর এবং তত্ত্বমূলক। সাধারণের পক্ষে এর মর্ম উদ্ধার করে বিষয়ের গভীরে যাওয়া খুব সহজ নয়। তাই সাধারণের কাছে ত্রিপিটকের উপদেশ ও শিক্ষা সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা বুদ্ধের সমকাল থেকে চলে আসছে। তখন থেকে মূলত অট্ঠকথা সাহিত্যের সূচনা। অট্ঠকথা রচয়িতাগণ নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে ত্রিপিটকের বিশ্লেষণাত্মক ভাষ্য রচনা করেছেন।

জাতক অট্ঠকথা এর বিশেষ এবং মূল্যবান একটি গ্রন্থ যেখানে জাতক সাহিত্যের বিবিধ গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, নানা অর্থের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পালি এবং প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যে জাতক সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের আলোকে অভিসন্দর্ভটির যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে জাতক পরিচিতির মধ্যে জাতকের পরিচয়, জাতকের গঠন প্রকৃতি, জাতকের রচয়িতা ও রচনাকাল, সংগ্রহকাল, গাথা, বর্গ, নাম এবং জাতকের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় জাতক একটি ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য বহুল এবং অন্যতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়া জাতকের উৎস অর্থাৎ এটি কোথায়, কখন, কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভব হয়েছে তার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই সামগ্রিক আলোচনা সাপেক্ষে এ অধ্যায়ে জাতকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতকে প্রাচীন ভারতবর্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বিষয়াদি পাওয়া যায়, তেমনিভাবে গ্রাম, নগর, জনপদ সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে জাতক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গেক্রমে অন্যান্য পালি, সংস্কৃত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্য উপস্থাপনপূর্বক জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতে অনেক গ্রাম, দেশ, নগর ও জনপদের নাম পাওয়া যায় এবং এসব গ্রাম, নগর ও জনপদে নানা শ্রেণি পেশার লোক বসবাস করতো। অতএব বলা যায় প্রাচীন কালের ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে রাষ্ট্র ও কাঠামো বিকাশ লাভ করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধের সমসাময়িককালের এবং পরবর্তী কয়েক শতবর্ষ পরিব্যপ্ত ভারতীয় সমাজ জীবনে নর-নারীদের জন-জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং বিচার বিশ্লেষণে এ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের নর-নারীদের জন জীবন সম্পর্কে উপস্থাপন করা হলো। প্রাচীন ভারতবর্ষের নর-নারীদের জন-জীবন সম্পর্কে আলোচনায় বিবাহ প্রথার মধ্যে বহু প্রকার বিবাহের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনযুগে রাজকুলের মধ্যেও বহু বিবাহের কথা পাওয়া য়ায়। সে সময়ে পুরুষরাই শুধুমাত্র সিংহাসন লাভ করতেন তা নয়, নারীরাও সিংহাসন লাভ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতো। পুরুষদের মতো নারীদেরও একাধিক পতিগ্রহণের কথা জানা যায়। সে সময়কার নর-নারীরা ঘর-সংসার, বিপুল ঐশ্বর্য, ধন, ত্যাগ করেও ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতো। শুধু তাই নয়, শিল্প বিদ্যা ও শিক্ষা সম্পর্কেও তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও পশুপাখি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত জাতক সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পশুপাখি সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া য়ায়। এসব তথ্যের সঙ্গে পালি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করে এ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পশুপাখি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে জাতক সাহিত্যে প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রচুর পর্বত, হিমালয়,

Dhaka University Institutional Repository

নদী, হ্রদ, পাহাড়, জলাশয়, প্রভৃতির নাম এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পশু, পাখি, বৃক্ষ ও ঋতুর নামোল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় যেমন শশ্মান, অরণ্যে, নদীর তীরে, হিমালয়ে, বৃক্ষমূলে অথ্যাৎ অরণ্যচারী হয়ে যে বসবাস করেছেন তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় এ অধ্যায়ে। বলতেই হয় আড়াই হাজার বছর পূর্বে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম একজন পরিবেশবাদী যা বর্তমান বিশ্বকে ছাড়িয়ে গেছে।

পঞ্চম অধ্যায় জাতকে প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য বিচার বিশ্লেষণে এ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে নানা ধর্ম বর্ণ ও জাতের মানুষ ছিল। তাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য ছিল এ সব বর্ণ বৈর্ষম্য, বিশেষ করে সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষের সাথে নিম্নবর্ণের যে বিশাল ব্যবধান ছিল এ সব বিষয়গুলো এনে প্রাসঙ্গিঁক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যার্জন ও শিক্ষালাভের কথাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ঐ সময়ে বড় বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলেও গুরুগৃহে সবাই শিক্ষা লাভ করতো। সে সময়কার নানা সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কেও নানা তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানকালের মতো সে সময়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা, আবৃত্তি, নাটক ও অন্যান্যর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এছাড়া সামাজিক নানা ধরনের রীতিনীতিও প্রচলিত ছিল। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জাতক সাহিত্যের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষ উপসংহারে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিঁ, মতামত এবং জাতকসহ বৌদ্ধ নানা গল্প সাহিত্য তথা ত্রিপিটকের নানা গ্রন্থ থেকে উপজীব্য বিষয়গুলো এনে উপসংহারটি তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায় বিশিষ্ট অভিসন্দর্ভটির আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষ একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রদান করা হয়েছে যেখান থেকে আমি নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে যেসব গ্রন্থগুলো আমার অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক ছিল সেসব গ্রন্থগুলোর নাম আমি সন্নিবেশিত করে আমার সমগ্র অভিসন্দর্ভ কর্মটি সমাপ্ত করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঃ	জাতক পরিচিতি	১-২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের নগর সমীক্ষা	২৬-৫১
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	জাতক সাহিত্যে নর-নারী ও জন-জীবন	৫২-৭৪
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	জাতক সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ	৭৫-১০৬
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	জাতক সাহিত্যে নানা পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা	১০৭-১৫২
উপসংহার	ঃ		১৫৩-১৫৮
গ্রন্থপঞ্জি	ঃ		১৫৯-১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জাতক পরিচিতি

ভূমিকা

পালি সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে জাতক সম্পর্কে বহু প্রকারের আলোচনা পাওয়া যায়। তেমনিভাবে জাতক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য বহুল ইতিহাস সমৃদ্ধ মূল্যবান তথ্য পাওয়াও সম্ভব। তাই বিভিন্ন গ্রন্থের সমন্বয় সাধন করে জাতকের যথার্থতা প্রতিপাদন করা হবে।

পালি ভাষায় রচিত সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। জাতক এমন একটি গ্রন্থ যা শুধুমাত্র বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে সমাদৃত নয় বিশ্ব সাহিত্য দরবারে এর মূল্য অপরিসীম। জাতকে তথাগত গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের বিভিন্ন চিত্র ও বিচিত্র কাহিনীগুলো উল্লেখিত হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ এক জন্মে এবং এক কর্মে বুদ্ধ হননি। তিনি বুদ্ধ হওয়ার জন্য এবং বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের জন্য বিভিন্ন জন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী সাধনা করেই বুদ্ধ হয়েছেন। এছাড়া পালি সাহিত্য এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি বুদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় তিন প্রকারের পারমী পূর্ণ করেছিলেন এবং প্রতিটা জন্মে বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পারমীগুলো পূর্ণ করার লক্ষ্যে বোধিসত্ত্ব অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বিভিন্ন যোনিতেও পরিগ্রহ করেন। তথাগত এই অসংখ্য জন্মে পরস্পর যোগসূত্রবদ্ধ অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের হেতুপ্রত্যয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং এ থেকে তিনি জাতিস্বর জ্ঞান লাভ করেন। যার ফলে অতীত জীবনের বিভিন্ন কাহিনীগুলো তিনি শিষ্যদের নিকট অতি মনোরম ও চমকপ্রদভাবে ব্যক্ত করতেন যা শিষ্যরা অতি সহজভাবে ধর্মের তত্ত্বগুলো গভীরভাবে হৃদয়ে আকৃষ্ট করতে পারতেন। [১]

'জাতক' শব্দটি 'জাত' শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'জাতক' শব্দের অর্থ উৎপন্ন, উৎপত্তি, উদ্ভূত, প্রসূত, জন্মগ্রহণ, জন্মলাভ ইত্যাদি।[২] সংস্কৃত জিন্ +ত (ক্ত) ক জাতক। [৩] এক কথায় জন্মগ্রহণ করা এ অর্থে জাতক। অর্থাৎ যিনি উৎপন্ন হয়েছেন বা জন্মলাভ করেছেন তিনিই জাতক। পালি সাহিত্যে একমাত্র তথাগত গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীর বৃত্তান্ত বোঝাতেই 'জাতক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের পূর্ব জন্ম কাহিনী বোধিসত্ত্ব হিসেবে জাতকে বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদের নানা

ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত এবং ঐসব কাহিনী জীবন দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গন্য করা হয়েছে।[৪] অন্যদিকে জাতক শুধুমাত্র ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় নয় বরঞ্চ প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতের জন-জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রণালীও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে অতএব, এ জাতক গ্রন্থটি ত্রিপিটকের একটি অন্যতম গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হবে না।[৫] গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পারমী পূর্ণ করে পাঁচশত পঞ্চাশ বার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তথাগত কখনোই একইভাবে একই রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি দশ পারমী, দশ পরমার্থ পারমী ছাড়াও লোকার্থচর্যা, জাতিচর্যা এবং বুদ্ধার্থচর্যা এই তিন প্রকারের চর্যা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধের কর্মফলে তিনি কখনো রাজা, প্রজা, দেবতা, বণিক, কখনো সম্ভ্রান্ত, কখনো চণ্ডাল, কখনো ময়ূর, হাতী, বাঘ, সিংহ, অশ্ব, বিড়াল, ভেড়া, আবার কখনো রাজ হংসরূপে জন্মলাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক জন্মেই তিনি একটা না একটা পারমী পূর্ণ করেছিলেন এবং পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। [৬]

ভগবান তথাগত বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী বুদ্ধাঙ্কুর বেশে কোটি কল্পকাল নানা যোনিতে পরিগ্রহ করে নানা প্রকারের পারমিতার অনুষ্ঠান সমাপ্তি করে উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বিমুক্ত উভয় চরিত্রে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রজ্ঞালাভ করে অভিসম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অভিসম্বুদ্ধ হয়ে "পূর্বনিবাসজ্ঞান" লাভ করেছিলেন। অতীত জন্মের কাহিনী নিজে দর্শন করেছেন। এতে গৌতমবুদ্ধের জাতিস্বর জ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়। বুদ্ধ নিজে শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় ঐসব কাহিনীগুলো বর্ণনাপূর্বক জগতের ভাল-মন্দ, কুশল-অকুশল, বর্তমান, অতীত, এবং ভবিষ্যৎসহ বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে তাঁদেরকে নির্বাণমূখী করতেন। এমনকি তথাগত নিজের পিতাকে মহাধর্মপাল জাতক বলে স্বধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়াও চন্দ্রকিন্নর জাতকে যশোধরার পতিব্রত ধর্ম, বর্ণিত যেখানে পূর্বজন্ম সংস্কারজাত, সেটি তিনি উপলব্ধি করেন। [৭] একইভাবে স্পন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম ও সম্মোদমান [৮] এই পাঁচ জাতক শুনে তথাগত শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিরোধ নিবারণ করেছিলেন।

পালি ভাষায় জাতক

'জাতক' শব্দটি পালি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সমস্ত জাতক পালি ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। পালি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সোদরা বা পুত্রী। এই ভাষার উৎপত্তিস্থান মগধ বা কলিঙ্গ। কিন্তু এটি বিচার সাপেক্ষ। এর শব্দগত, উচ্চারণগত, ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

এটি উৎকল, বঙ্গের প্রাচ্য ভাষারই নিদর্শন। এটি এক সময়ে ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের পালি আর্যদের সাধারণ ভাষা ছিল বলে মনে করেন অধ্যাপক অটো ফাঙ্ক। প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আগে পালি ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি বলে জানা যায়। কিন্তু যে গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ নানারত্নে প্রসিদ্ধ হয়েছিল তাঁরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চর্তুঞ্চল জুড়ে ভ্রমণ করেছিল তাইতো দেখা যায় ভারতের নানা স্থানে বুদ্ধের প্রধান তীর্থস্থান। তন্মধ্যে উত্তরে ছিল কপিলাবাস্তু ও শ্রাবস্তী, দক্ষিণে রাজগৃহ এবং বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাংকাশ্য এবং পূর্বে ছিল অঙ্গ ও বৈশালী এ সুবিশাল অঞ্চল নিয়েই ছিল বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র। এ অঞ্চলের মানুষেরা এখানকার প্রচলিত ভাষাতেই তারা তাদের ভাবমূর্তি প্রকাশ করতো এবং ধর্মদেশনা করতো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এসব অঞ্চলের ভাষাই ছিল পালি যা সব জনসাধারণের ভাষা। পরবর্তীতে পালি ছাড়াও গুজরাটি, মারাঠী, উর্দু, ফার্সি ও বাংলা প্রভৃতি ভাষায় প্রচলন হলেও দেশ-বিদেশে পালির গুরুত্বই ছিল বেশি। [৯]

রচয়িতা ও রচনাকাল

জাতকের রচয়িতা ও রচনাকাল নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জানা যায় এক সময়ে জাতক নিয়ে উত্তর ভারত ও সিংহলে পালি ভাষায় বহু চর্চা ও গবেষণা হয়েছিল। এই পালি ভাষা আবার উত্তর ভারতের সমগ্র মানুষের সাধারণ ভাষায় রূপ নিয়েছিল। তদ্রুপ মূল পালি যাতে বিকৃত না হয় অর্থাৎ অবিকৃত রাখার জন্য বিভিন্ন সাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। কিন্তু জাতকের রচয়িতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ মতানৈক্যর সৃষ্টি হয়। অনেক পণ্ডিত বুদ্ধঘোষকে জাতকের রচয়িতা বলে মনে করেন। এছাড়া জাতকের রচয়িতা হিসেবে আরো কয়েকজন সিংহলী পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন ভদন্ত রেবত, সংঘপাল, অত্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা।[১০]

দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধদের কাছ থেকে খ্রিষ্ট্রের ২৪১ বছর আগে মৌর্য সম্রাট ধর্মাশোকের পুত্র মহেন্দ্র যখন সিংহলে গমন করেন তখন তিনি পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র সিংহলী ভাষায় এর অর্থকথাগুলোর অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থকথার মূল বিনষ্ট হয়ে যায়। পূর্বোক্ত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে মগধজাত ব্রাহ্মণ পুত্র বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়ে পালিভাষায় পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, পরিশেষে সিংহলে অনুবাদ বিনষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে সিংহলীরা বুদ্ধঘোষের পালি অনুবাদকেই মূল স্থানীয় করে পুনর্বার এগুলো অনুবাদ করেন। অনেকে আবার মনে করেন জাতাকার্থ বর্ণনা বুদ্ধঘোষের লেখনী প্রসূত। আচার্য বুদ্ধঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের স্থবির রেবতের নিকট ও সিংহলে স্থবির সংঘপালের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু জাতকের বর্ণনার মধ্যে এর উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বুদ্ধঘোষ কর্তৃক অনূদিত জাতক বর্ণনা তার সময়ে কিংবা তার পরবর্তী এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে তবে [১১] পরবর্তীকালে বুদ্ধঘোষকে বিভিন্ন পালি ভাষ্যকারগণেরা 'জাতকত্থবণ্ণনা' রচয়িতা হিসাবে আখ্যায়িত করতে দ্বিমত পোষণ করেননি। এরপরেও জাতকের রচয়িতা বুদ্ধঘোষকে মনে করলেও আধুনিককালের অর্থাৎ বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ জাতকের রচয়িতা বুদ্ধঘোষকে মেনে নিতে রাজী নন।

এটা মেনে না নেওয়ার যথার্থ কারণ আছে। যেমন আচার্য বুদ্ধঘোষ সিংহলের মহানাম রাজার সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি খ্রিষ্টীয় প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে ভারত ও সিংহলে জাতকের পঠন-পাঠন বর্তমান ছিল। কিন্তু এটাও অভ্রান্ত নয় যে বুদ্ধঘোষের অবদানেই যে সিংহলে পালি ভাষায় ও জাতকের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসিদ্ধ মহাযানী গ্রন্থ সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকের মতে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের গাথা, গল্প, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন উপদেশ দান করতেন। বুদ্ধের এ উপদেশ বুদ্ধ শিষ্যরা অনুসরণ করে থাকেন। এ থেকে নতুন নতুন কাহিনী উদ্ভব হয়ে জাতকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন জাতকের কাহিনী পর্যালোচনা করলে সবগুলো জাতক বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত হয়েছে এমন নয়। জাতকের আখ্যানগুলোর রচনার মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য, পুনরাবৃত্তি, দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষা ও ভাবগত অনেক পার্থক্য থেকে যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, জাতক গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়েছিল।[১২] ভারতবর্ষের মানুষের আত্মবিশ্বাস মহাভারত ও রামায়ণের রচয়িতা কাশীরাম এবং কৃত্তিবাস। জানা যায় এ দু'জন ব্যক্তিই রামায়ণ ও মহাভারতের রচনার জন্য বিশেষভাবে অবদান রেখেছিলেন। ঠিক একইভাবে বুদ্ধঘোষের নাম জাতকের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।[১৩] কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের গ্রন্থনাকাল জাতকের আগে নয়। তবে রামায়ণ ও জাতক প্রাচীন। জাতকের রচনা পদ্ধতি রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এর চেয়ে তেমন কাব্যোৎকর্ষ মণ্ডিত নয়। বরং জাতকের তুলনায় এসব গ্রন্থ বর্ণনাচাতুর্যে, ভাব মাধুর্যে ও চরিত্র বিশ্লেষণে অদ্বিতীয়। তাই সেক্ষেত্রে ধারণা করা যায় জাতকের আখ্যানসমূহ এসব গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল। জাতক যদি রামায়ণ এবং মহাভারতের চেয়েও প্রাচীন হয় সেক্ষেত্রে জাতকের উদ্ভব হয় খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকের পূর্বে। কারণ গৌতমবুদ্ধ নিজে শিষ্যদেরকে জাতক সম্পর্কে এবং জাতকের কাহিনীগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভাষণ দান করেছিলেন। আবার জাতকের গ্রন্থনাকাল বা

Dhaka University Institutional Repository

সংকলনকালের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতামতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কিছু পণ্ডিতেরা ধারণা করেন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহের প্রথম সংগীতে ত্রিপিটকের দুই অংশ অর্থাৎ সুত্ত ও বিনয় পিটক সংকলিত হওয়ার পরেই জাতক সংকলিত হয়। কারণ জাতক সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি গ্রন্থ। এক্ষেত্রে ধারণাটি ভ্রান্ত বলে মনে করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আবার পশ্চিমা পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রি.পূ. ৩৭০ অব্দে রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীতে যে মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই সমস্ত পিটক অর্থাৎ ত্রিপিটক সংকলন হয়। এসব ধ্যান ধারণা থেকে নিঃসন্দেহে অনুধাবন করা হয় যে, জাতকের রচনাকাল খ্রিষ্টজন্মের আগে অর্থাৎ ৩৭০ বৎসরের পূর্বে। [১৪]

জাতকের অংশ

জগতে প্রতিটি বস্তু বা জিনিসের একটা না একটা অংশ থাকে। তেমনি জাতকেরও কিছু অংশ আছে। যেমন বলা যায় জাতকের তিনটি অংশ। যথাঃ

প্রথম অংশ

প্রতুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা।

দ্বিতীয় অংশ

প্রকৃত জাতক অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা, যার নাম অতীত বস্তু।

তৃতীয় অংশ

সমবধান অর্থাৎ এখানে গৌতম বুদ্ধ কি উপলক্ষে বা কোন প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটি বলেছিলেন অর্থাৎ বর্তমান কথা বুঝিয়ে দেওয়া এই প্রথম অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশে অতীত বস্তু এখানে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনী অর্থাৎ বুদ্ধ কখন, কোথায়, কিভাবে, কিরূপে জন্মলাভ করেছিলেন তার প্রত্যেক কাহিনী বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশ সমবধান। এই অংশে অতীত বস্তু বর্ণিত পাত্রদের সাথে বর্তমান বস্তু বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদ প্রদর্শন। উপরোক্ত তিন অংশ বিভাগ হতে উপলব্ধি করা যায় যে, বর্তমান বস্তুটি মূল জাতকের অঙ্গ নয়, ব্যাখ্যা মাত্র। সমবধানগুলো বৌদ্ধদের জন্মান্তরবাদের সমর্থক।[১৫] এছাড়াও উপরোক্ত তিন অংশের জাতক ছাড়া আরো দুই অংশের জাতকের নাম পাওয়া যায়। সেটি হলো গাথা ও বেয়াকরণং।

Dhaka University Institutional Repository

গাথা

এটি জাতকের চতুর্থ অংশ বা অভিসমুদ্ধ গাথা ও পদ্য মিশ্রিত অতীত বস্তুর পদ্যাংশকেই গাথা বলা হয়। প্রত্যেক জাতকে একটি না এক বা একাধিক গাথা থাকে।

বেয়াকরণং

এটি জাতকের সর্বশেষ বা পঞ্চম অংশ। এ অংশে গাথার টীকা বা ভাষ্য দেওয়া আছে। অর্থাৎ সেই গাথার বিস্তৃতি ব্যাখ্যাও জাতকে দেওয়া হয়। একে পালি বেয়াকরণং বলে। [১৬]

জাতকের সংখ্যা

আসলে জাতকের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা দু:সাধ্য ব্যাপার এবং এ নিরূপণে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতভেদের সৃষ্টি হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আচার্য বুদ্ধঘোষ খ্রিষ্ট্রীয় পঞ্চম শতকে জাতকের ভাষ্য গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'জাতকত্থবণ্ণনা'। জানা যায় এ 'জাতকত্থবণ্ণনা' মূল জাতকের মতোই পালিতে অনূদিত হয়েছিল। বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটিতে পাঁচশতটি জাতক অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে অর্থাৎ আঠার শতকের দিকে অধ্যাপক ফৌজবল ছয় খণ্ড জাতক প্রকাশ করেছিলেন লন্ডন পালি টেক্সট সোসাইটির উদ্যোগে। পরে ঐ ছয় খণ্ডটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে লন্ডন পালি টেক্সট সোসাইটি সেখানে জাতকের সংখ্যা ছিল পাঁচশত সাতচল্লিশটি (৫৪৭)।

এছাড়া জাতক সর্বপ্রথমে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ঈশানচন্দ্র ঘোষ। তিনি বাংলাদেশের যশোর জেলায় ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জানা যায় তিনি ১৮৮২ সালে এম এ পাস করেন এবং কলেজ শিক্ষক হিসেবে প্রথমে চাকুরীতে পদার্পণ করেন। পরবর্তীতে কলকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে খুবই সুনাম অর্জন করে বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় তেরটি বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্য বই রচনা করেন। জানা যায় ১৯১৩ সালের দিকে তাঁর পরিবারের এক নাবালক সদস্যের মৃত্যুতে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং সে সময় তিনি অন্তর্দাহ হতে মুক্তির কামনার জন্য জাতকমালা অনুবাদের দুরূহ কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অধ্যাপক ফৌজবলের অনুকরণে ছয়খণ্ডের সমগ্র জাতকের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি আনুমানিক ষোল বছরব্যাপী সমগ্র জাতক অনুবাদ করেছিলেন এবং সেখানে জাতকেরর সংখ্যা ছিল পাঁচশত সাতচল্লিশটি। [১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও উদীচ্য বৌদ্ধ জাতকমালা নামে একটা সংস্কৃত গ্রন্থ আছে তাতে ৩৪টি জাতকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে এই ৩৪টি জাতককে আদি জাতক এবং গৌতম বুদ্ধকে "চতুস্ত্রিংশজাতকজ্ঞ" নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। এছাড়া উদীচ্য বৌদ্ধদের "মহাবস্তু" নামক অন্য একটি গ্রন্থে ৮০টি জাতকের নমুনা পাওয়া যায়, কিন্তু এটিও ভিত্তিহীন। জাতকের সংখ্যা সম্পর্কে অধ্যাপক "হজসন"বলেন তিব্বতে ৫৬৫ (পাঁচশত পয়ষট্টি) বিশিষ্ট একটি বৃহৎ জাতকমালা আছে। তাহলে "চুতস্ত্রিংশজাতকজ্ঞ" নাম আর্যশূর রচিত জাতকমালার পরবর্তী সময়ে কল্পিত হয়েছে। উদীচ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধশাস্ত্র বহু প্রাচীন। দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধশাস্ত্রে ৫৫০ টি জাতকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংখ্যা স্থুল নির্দেশ মাত্র। পালি গ্রন্থকারেরা এটাকে স্থুল সংখ্যা নির্দেশের পক্ষপাতী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ যিনি ধনী ব্যক্তি তিনি অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি বলে পরিচিত। যিনি আচার্য তিনি পঞ্চশত শিষ্য পরিবৃত। যিনি সার্থবাহ তিনি পঞ্চশত শকট নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেতেন। এভাবে জাতকের সংখ্যা হিসাব করলে ৫৫০টি দাঁড়ায়। কিন্তু ৫৫০টি জাতকের উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে ৫৪৭টি জাতক পাওয়া যায়। ৫৪৭টি জাতকের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া না গেলেও উদাহরণস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ বর্তমান খণ্ডের কুলায়ক জাতক (৩১) কথা উল্লেখ করা হলো। এ জাতকেই বোধিসত্ত্ব দু'বার জন্ম গ্রহণ করেছেন। এছাড়া একই জাতক কোথাও ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন নামে, আবার কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের মুণিকজাতক (৩০) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শালক জাতক (২৮৬), প্রথম খণ্ডের মৎস্য জাতক (৩৪) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মৎস্য জাতক (২১৬), প্রথম খণ্ডের আরামদূষক জাতক (৪৬) গ্রন্থকারেরা স্থুল সংখ্যা নির্দেশের পক্ষপাতী ছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডের আরামদূষক জাতক (২৮৬), প্রথম খণ্ডের বানরেন্দ্র জাতক (৫৭) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কুম্ভীর জাতক (২২৪) প্রভৃতি।

এছাড়া প্রথম খণ্ডের সর্বসংহারক প্রশ্ন (১১০), গদর্ভ প্রশ্ন (১১১) ও অমরাদেবী প্রশ্ন (১১২) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কৃকণ্ঠক জাতক (১৭০), শ্রীকালকর্ণী জাতক (১৯২) ও মহাপ্রনাদ জাতক (২৬৪)। এদের উপাখ্যানাংশ জানতে প্রথম পাঁচটির জন্য মহাউন্মার্গ জাতক (৫৪৬) এবং ষষ্ঠটীর জন্য সুরুচি জাতক (৪৮৯) পাঠ করতে হবে। প্রথম খণ্ডে ভোজাজানেয় জাতক (২৩) এবং আজন্ন জাতক (২৪) একই আখ্যায়িক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত। সেরূপ প্রথম মিত্রবিন্দক জাতকে (৮২) এবং দ্বিতীয় মিত্রবিন্দক জাতকে(১০৪), পরসহস্র জাতক (৯৯) এবং পরশত জাতকে (১০১), ধ্যানশোধন জাতকে (১৩৪) ও চন্দ্রভাগ জাতকে (১৩৫) এদের পার্থক্য অতি সামান্য। এখানে বোধিসত্ত্ব অনেক জাতকে

Dhaka University Institutional Repository

একবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। সেগুলো হিসাব করলে জাতকের সংখ্যা ৫৪৭টির কম। জাতক বর্ণনায় নিদান কথাতে মহাগোবিন্দ জাতকের নাম দেখা যায়। কিন্তু উল্লেখিত ৫৪৭টি জাতকের মধ্যে এই নামের কোন স্থান নেই। এছাড়া সূত্রপিটক, শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশে কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতকের নাম পাওয়া যায়। ফলতঃ জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলোর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। দেখা যায় যখন যার সুবিধা মতো বৌদ্ধবেশে এবং বোধিসত্ত্বকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে জাতক নাম দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন। এভাবে পণ্ডিতেরা নানা সময়ে নানা সংকলন লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে তিব্বত দেশের বৃহজ্জাতকমালা এবং সিংহলের জাতকার্থবর্ণনা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। জাতক বর্ণনায় উপসংহারে প্রথম খণ্ডে প্রথম পঞ্চাশটি জাতকে "পঠমো পঞ্ঞাসো", দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চাশটির শেষে মজঝিম "পঞ্ঞাসো নিটঠিতো"। এভাবে জাতকের সংখ্যা গণনা করলে সংখ্যা দাড়ায় ৫৫০।

জাতকের অধ্যায় বা নিপাত

জাতকের সংখ্যানুসারে জাতকের নিপাত নির্ণয় করা হয়। তাই গাথানুসারে জাতক ২২টি নিপাতে বিভক্ত। এ সকল জাতকগুলো একেক একেক গাথায় গঠিত। যে সকল জাতকে একটিমাত্র গাথা আছে সেগুলোকে "এক নিপাত"বলে। "এক নিপাত" অর্থাৎ এক শ্লোকের প্রবন্ধ নামে পরিচিত। এভাবে দুক নিপাত, তিক নিপাত চতুক নিপাত, পঞ্চম নিপাত ইত্যাদি। তন্মধ্যে প্রথম ১৩টি নিপাতে ৪৮৩টি জাতক সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী চতুর্দশ অধ্যায়ে ১৩টি জাতক "পকিন্নক" (প্রকীর্নক) নিপাতভুক্ত কারণ এদের গাথার সংখ্যার মধ্যে কোন ধরা বাধা নেই। কোনটা ১৫ টা, কোনটা ৪৮টা পর্যন্ত গাথার লক্ষণ পাওয়া যায়। এরপর সাতটি নিপাতের নাম যথাক্রমে বীসতি, তিংস, চত্তালীস, পঞ্ঞাস, সট্ঠি, সত্ততি ও অসীতি। যেগুলোতে ২০ হতে ২৯ পর্যন্ত গাথা আছে সেগুলো বীসতি পর্যায়ভুক্ত, এভাবে তিংস, সর্বশেষে ৫৩৮ হতে ৫৪৭ পর্যন্ত দশটি জাতক বিদ্যমান যাতে মহানিপাতের অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রত্যেক গাথার সংখ্যা শতাধিক। অনেক পণ্ডিতদের মতে এভাবে অধ্যায়ের নির্ণয় করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ দেখা যায় কোন বিষয়ের বিষয়গত কোন ভাব প্রকাশ পাওয়া যায় না। তাহলে কিভাবে নিপাত অনুসারে অধ্যায় নামকরণ হবে? তাই "দশ নিপাতে" দেখা যায় কৃষ্ণ জাতকের গাথার সংখ্যা দশ না হয়ে তের হয়েছে। উল্লেখ্য যে এখানেও ঠিক জাতকের নিয়মের বিভ্রান্তি ঘটেছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় গ্রন্থকারেরা গাথার সংখ্যা দ্বারা অধ্যায় নির্ণয় করেছিলেন। গাথা প্রবন্ধকে সুরময়, ছন্দময় করে তোলে কারণ গাথাগুলোই হলো প্রবন্ধের বীজ এবং প্রাণস্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতকের বর্গ

জাতকে নিপাত বা অধ্যায় শুধু যে আছে তা নয় বর্গেরও উল্লেখ আছে। এখানে এক থেকে নয় নিপাত অর্থাৎ দশ জাতক নিয়ে একটি বগ্গ (বর্গ) গঠিত হয়। এক নিপাতে ১৫টি বর্গ থাকে। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু স্ব স্ব শ্রেণির প্রথম জাতকের নামে অভিহিত। যেমন অপণ্ণক বগ্গ (১-১০), আবার কোনটা বিষয়গত সাদৃশ্য নিয়ে কল্পিত, যেমন সীলবগ্গ (১১-২০), ইত্থি বগ্গ (স্ত্রী বর্গ ৬১-৭০), কিন্তু এদের যে ভ্রম ত্রুটি বিচ্যুতি নেই তা বলা যাবে না। শুধুমাত্র স্ত্রীবর্গেই দেখা যায় কুদ্দাল জাতকের সাথে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েকটা জাতকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

জাতকের নাম

জাতক বর্ণনাতে একই জাতকের নাম বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থকার একটি বা একাধিক জাতকের নাম নিয়ে একাধিক জায়গায় বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছে। তাই জাতকের বর্ণনাতে দেখা যায় প্রথম খণ্ডের তৈলপত্র জাতককে 'তক্ষশীলা জাতক' বলে নির্দেশ করেছেন। তেমনি প্রথম খণ্ডে যেটি 'বানরেন্দ্র জাতক', সেটি দ্বিতীয় খণ্ডে 'কুম্ভীর জাতক' বলে স্থান দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতকে কচ্ছপ জাতককে ধম্মপদে 'বহুভাণিক জাতক' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেরুট কুম্ভীর একটি চিত্র বিড়াল জাতক ও কুম্ভীরজাতক উভয় নামেই স্থান পেয়েছে। এভাবে জাতকের নাম দেওয়ার কারণে পাঠকের মনে অতি সহজেই বোধগম্য হয়। তাতে করে পাঠক খুব কম সময়ে জাতক নির্ণয় করতে পারে। অনেক সময় কোন কথার নামকরণের সময় তার উপদেশটির দিকে লক্ষ্য করেন এবং সাধুতার পুরস্কারের জন্য এরূপ কোন নাম দেন। আবার অন্য কেউ কথাটির পাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে এবং অসাধু কাঠুরে বলেন। তেমনি বিরোচন জাতকটি নামকরণের ইচ্ছামতো "সিংহ জাতক, শৃগাল জাতক বা দুরাকাঙ্খার পরিণাম আখ্যাও পেতে পারে। তাই জাতকের বর্ণনায় দেখা যায়, কোন কোন জাতক শুদ্ধ গাথার আদি শব্দ দ্বারা অভিহিত। উদাহরণস্বরূপ প্রথম খণ্ডের সত্যংকির জাতক প্রদর্শন করা হয়েছে।

জাতকে গাথা

জাতক বর্ণনায় গাথার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। গাথা ভিন্ন জাতক অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ গাথা জাতকের প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ গাথা জাতককে সুরময়, ছন্দময় করে তোলে। এদের ভাষা অনেক পুরাতন। এই ভাষা এতটাই প্রাচীন যে অংশ বিশেষে দুর্বোধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে আখ্যানগুলো লিপিবদ্ধ হওয়ায় আগে তারা সব সময় গাথাআকারে মানুষের মুখে মুখে চলে আসত এবং গাথা শুনে সমস্ত আখ্যানটি নয় তাদের সমস্ত উপদেশ বুঝে নিতেন।[১৮]

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি" "এক বুদ্ধিরহং ভদ্রে ক্রীড়ামি বিমলে জলে" প্রভৃতি শ্লোকের বা শ্লোকাংশের এবং পুনর্মুষিকোভব" বিড়াল তপস্বী," "বকোহহং পরম ধার্মিকঃ, "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ,[১৯] ইত্যাদি বাক্যের বা বাক্যাংশের সাহায্যে কত প্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্তায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত আছে। আবার অনেক জাতকের গাথার এবং গদ্যাংশে ভাষায় ও ভাবের কোন প্রকার প্রভেদ দেখা যায় না। মনে হয় গদাংশগুলো গাথারই প্রকাশ। জাতক বর্ণনার মধ্যে সিংহলের অনুবাদ থাকলেও, প্রাচীন ভারতবর্ষে পালি গাথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন সময়ে পালি গাথাগুলো পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে ভিক্ষু সমাজে প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসব গাথা যে শুধু জাতকের এমন নয়, ধম্মপদ এবং অনান্য শাস্ত্রেও গাথার প্রচলন আছে। বিশেষকরে যে গাথাগুলোর মধ্যে জাতকের নিজস্বতা থাকে সেই আখ্যানটি সম্পৃক্ত। আবার বণ্ণুপথ জাতকের গাথাতে ঠিক একইরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উত্তরকালে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃপঙ্কে সুদুস্তরে বৃদ্ধব্যাঘ্রেন, সমপ্রাপ্তঃ পথিকঃ সংমৃতো যথা "মার্জারস্যহি দোষেণ হতো গৃধো জরদগবঃ" ইত্যাদি গ্রন্থগুলো শ্লোক আখ্যানের জন্য রচিত হয়েছিল। কিছু শ্লোক মহাভারত, শান্তি শতক এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংযোজিত করা হয়েছে। ভাব এবং ভাষা এক নয় এদের সব গাথাও এক নয়। ভাষায় কোথাও কোথাও ধ্বনিতে মুখরিত, কোথাও নির্দোষ ত্রুটিমুক্ত ভাবে, কোথাও নির্দোষ, ভাব কবিত্বপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী, কোথাও জটিল ইত্যাদি। এগুলো হয়েছে একমাত্র একে অপর থেকে আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয়। কারণ একই ব্যক্তির দ্বারা যে সবকিছু রচিত হয়েছে এমন নয়। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে এ জন্যই গাথার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় জাতকে গাথার বক্তা বোধিসত্ত্ব কিংবা অতীত বস্তু বর্ণিত কোন প্রাণী। আবার কোথাও কোথাও বুদ্ধ প্রোক্ত গাথাও দেখা যায়। সমাপ্তি করার অনেক জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায় বুদ্ধ অনেক সময়ে আখ্যানটির ভাষ্য বলতে বলতে এক সময় শেষ পর্যায়ে চলে আসতেন। ঠিক সে সময়ে তাঁকে অভিসম্বুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

জাতকের সংগ্রহকাল

জাতকের সংগ্রহকাল কিংবা সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কখন, কোথায়, কিভাবে এটি সংকলন হয়েছে জানা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে আনুমানিক ধারণা থেকে মনে হয় জাতক গ্রন্থটি বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে একটি অন্যতম গ্রন্থ। এ থেকে মনে হয় বৌদ্ধরা জাতক সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক একইভাবে বৌদ্ধরা এদেশে প্রথম জাতকের প্রচার শুরু করেন। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। ত্রিপিটক তিন অংশে বিভক্ত। বিনয়, সুত্ত এবং অভিধর্ম। এই তিনটি পিটকের সমন্বয়ে ত্রিপিটক। বিনয় এবং সুত্ত পিটকে জাতক সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সুত্ত পিটকে জাতকের বহুবিধ আলোচনা আছে যা অন্য দুই পিটকে এতটা পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও চরিয়া পিটকে জাতক সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা পাওয়া যায়। সেখানে ৩৫টি জাতকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চরিয়া পিটকের দুই একটা জাতক ছাড়া অন্যান্য সব জাতক বর্ণনার জন্য উপযোগী।[২১] তথাগত গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীর বালুকারাম বিহারে দ্বিতীয় মহাসংগীতির অনুষ্ঠান হয়েছিল। আর এই মহাসংগীতি বৌদ্ধধর্মের সমগ্র পালি সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ অবদান রেখেছিল। শুধু তাই নয় ত্রিপিটকের উপর বিশেষ নজরদারি হয়েছিল। যাতে করে ত্রিপিটক সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শেষে উপলব্ধি করা যায় যে তখন থেকেই জাতক সংগ্রহের কাজ শুরু হয় বলে ধারণা করা যায়। [২২]

বিভিন্ন দেশে জাতকের প্রভাব

জাতক বৌদ্ধদের ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে এক অন্যতম গ্রন্থ। তাই গ্রন্থটি শুধুমাত্র এদেশেই সমাদৃত নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতক সম্পর্কে বহু আলোচনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে তৎস্থানীয় ভাষায় জাতক সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন পুরাণের কথা শুনতে পেয়ে হিন্দুধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তেমনি জাতকের কথা শুনেও বৌদ্ধ দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারে। সিংহল দেশে লক্ষ্য করলে মনে হয় আহার করা যেমন প্রতিদিনের কার্য, জাতক শ্রবণ করাও তেমন। এদেশের শিশুরা যেমন সন্ধ্যার পর উপকথা শুনে তেমনি সিংহলের শিশুরাও জাতক কথা শুনে। শুধু যে শিশুরা শুনে তা নয় বৃদ্ধ, যুবক সবাই। উল্লেখ্য যে, বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাহকজাতক শুনলে যেমন শিশুদের মুখে হাসি শোনা যায় তেমনি বিশ্বন্তর জাতক বা শিবিজাতক শুনলে বৃদ্ধের চোখে প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়। এক সময়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত ছিল। ঠিক সেই সময়ে সাধারণ জনগণ সবাই জাতক সম্পর্কে অবগত ছিলেন। জানা যায় বেরুটে যতগুলি বৌদ্ধস্তুপ তাদের অনেকগুলোর মধ্যে জাতকের চিত্র শিলাখণ্ডে উদীয়মান ছিল। আবার অনেক চিত্রের পার্শ্বে জাতকের নাম দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে স্তুপের নির্মাণকাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী। অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীতে ঐ সমস্ত জাতক লোকসমাজে পরিচিত ছিল। যাহোক প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল তখন জাতকের আলোচনাও ছিল। পরবর্তীতে ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে যায় তখন জাতকগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। জাতক শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও জাতকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পরবর্তীতে অনেক জাতক নতুন আকারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে সন্নিবেশিত হয়। [২৩]

জাতক প্রাচীন ও ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম স্বাক্ষর। কারণ জাতক এমন একটি গ্রন্থ যেখানে প্রতুৎপন্ন বস্তু থেকে প্রাচীন ভারতের বহু মূল্যবান ইতিহাস পাওয়া যায়। শুধু প্রাচীন ভারতের নয় বাংলাদেশের বহু ইতিহাস সেখানে সমৃদ্ধ আছে। তাই জাতকের যথাযথ আলোচনা, গবেষণা, পঠন-পাঠন ও অধ্যয়ন করলে প্রাচীন ভারতের বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান স্থান যেমন, কাশী, কোশল, অঙ্গ,মগধ বৈশালী, কুরু, কোসাম্বী, অবন্তী, বৎস, কলিঙ্গ, সুরসেন, সাকেত, পাঞ্চাল ইত্যাদি এসব অঞ্চল যেমন জাতক গ্রন্থের প্রত্যুপন্ন বস্তুতে আলোচিত। কিন্তু অন্যান্য পঠন-পাঠন, ভাষা রচনাপদ্ধতি সবকিছুতেই প্রাচীনত্বের আভাষ পাওয়া যায়। যার প্রকৃত প্রমাণ একমাত্র জাতক। মগধের রাজা বিম্বিসার অন্যান্য রাজাদের মধ্যে প্রথম বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। যার একমাত্র মাধ্যম জাতকের প্রতুৎপন্ন বস্তু থেকে। বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করার পর পরই বিম্বিসার বিভিন্ন রাজ্যে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। বিম্বিসার খুবই ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। মগধরাজ ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা। সম্ভবত বুদ্ধের বয়সের পাঁচ বছরের ছোট। তথাগত বুদ্ধ যখন প্রথম গৃহত্যাগ করে ভিক্ষান্নপাত্র নিয়ে মগধে এসেছিলেন তখন বিম্বিসার তার রাজ্যের কিছু পরিমাণ অংশ তাঁকে রাজত্ব করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তথাগত রাজি হননি। বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা লাভের আশায় রাজ সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। এজন্য তিনি বিম্বিসারের অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নাই।

জানা যায় পরবর্তীতে বুদ্ধত্ব লাভ করে বিম্বিসারের রাজ্যে আগমন করেছিলেন। জানা যায় তিনি শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি। পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার করার জন্য তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সংঘ থেকে দুবির্নীত ভিক্ষুদেরকে বহিস্কার পর্যন্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য রাজশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এভাবে বৌদ্ধধর্ম মগধ সাম্রাজ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করে। জাতকের প্রাচীন ইতিহাস থেকে যে বিম্বিসারের কথা জানা যায় তা নয়। তার পুত্র অজাতশত্রুর নামের উল্লেখও পাওয়া যায়। অজাতশত্রু মাত্র ষোল (১৬) বৎসর বয়সে সিংহাসনে পদার্পণ করেছিলেন। জাতক গ্রন্থে এটিও জানা যায় যে অজাতশত্রু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মাতৃরক্ত পান করেছিলেন বলে তার নাম রাখা হয় অজাতশত্রু। অজাতশত্রু রাজ্য লাভের আশায় হঠাৎ একদিন নিজ পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিম্বিসারের দেহরক্ষীরা অজাতশত্রুকে ধরে ফেলে। বিম্বিসার সাথে সাথেই রাজ্যের সমস্তভার তার কাধে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অজাতশত্রু রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েও সুন্দরভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পারেননি।

রাজকুমার খুব অল্প বয়সে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করায় নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। রাজকুমার দুঃশীল চরিত্রের অধিকারী দেবদত্তের বুদ্ধির দ্বারা নিজ পিতাকে হত্যা করেন। অজাতশত্রু দুঃশীল সহকর্মীদের প্ররোচনায় বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ধার্মিক পিতাকে নিজ হাতে হত্যা করলেন। বিম্বিসারের মৃত্যুতে স্ত্রী কোশলাদেবী মনোক্ষুন্ন হয়ে পড়লেন। পুত্রের দুষ্কর্ম সহ্য করতে না পেরে স্বামীর শোকে নিজ প্রাণ ত্যাগ করলেন। এ দুঃসংবাদ রাজ্যের আশে পাশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। অজাতশত্রুর এ নির্মম আচরণে রাজা প্রসেনজিত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। বিম্বিসার ও প্রসেনজিত পরস্পরের ভগ্নিপতি ছিলেন। মহারাণী কোশলাদেবীর পিতা মহাকোশল মেয়ের বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে কাশী রাজ্য বিম্বিসারকে দান করেছিলেন। পরবর্তীতে কোশলাদেবীর পুত্র অজাতশত্রু রাজ্যের অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু প্রসেনজিত ভাবলেন যে নিজ পিতাকে হত্যা করতে পারে তাকে আর কাশী রাজ্যের অধিকার দেওয়া ঠিক হবে না। অজাতশত্রুকে কাশী রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কাশি রাজ্য পর পর দু'বার অজাতশত্রুর নিকট পরাজয় বরণ করে। এতে প্রসেনজিত খুবই রাগান্বিত হয়ে পড়লেন এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য শকটব্যুহ নির্মাণ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কোশালরাজ প্রসেনজিত মগধরাজ্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং অজাতশত্রুকে বন্দী করলেন। পরবর্তীতে প্রসেনজিত বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ব্যাপার ভগবান বুদ্ধকে জানালেন। তথাগত তাদেরকে নানা রকম কর্মের কথা শোনালেন এবং এ রক্তক্ষয়

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম থেকে অবসান নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। রাজা বুদ্ধের এসব কথা শুনে খুবই প্রীত হলেন এবং বুদ্ধের অমৃতময় বাণী উচ্চরণ করলেন

"জযং বেরং পসবতি দুকখং সেতি পরাজিতো
উপসান্ত সুখং সেতি হিত্ব জযং পরাজয়ং।"[২৪]

অর্থাৎ বিজয়ীর শত্রু বৃদ্ধি পায়, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে, জয় পরাজয় বিহীন উপশান্ত ব্যক্তিই সুখে নিদ্রা যাপন করে।

বুদ্ধের এ অমৃতময় উপদেশে দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলো। রাজা প্রসেনজিৎ যুদ্ধের অবসান এবং শান্তি স্থাপিত করে নিজ কন্যা বজিরার সঙ্গে অজাতশত্রুকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। পুনরায় রাজা কাশিরাজ্যে অজাতশত্রুকে যৌতুক স্বরূপ দান করলেন এবং এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আবার সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হলো। অজাতশত্রু ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন এবং পাটলিপুত্র দুর্গ নির্মাণ করে বিম্বিসারের সীমানা ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করলো। পরবর্তীতে তিনি শুধুমাত্র কোশলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন তা নয়। কাশী, লিচ্ছবী, মল্ল এসব রাষ্ট্রকে পরাভূত করে ছিলেন। পরবর্তীতে বজ্জীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বৈশালীকে নিজের অধিকারে এনেছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে একটি অন্যতম ঘটনা হচ্ছে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে তথাগত ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন এবং এই সময়েই প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম মহাসংগীতির মধ্যেই ত্রিপিটক গ্রন্থটি সংকলিত। ঠিক এই সময়েই রাজা প্রসেনজিৎ বিরুডবের সেনাপতির দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে রাজগৃহের এক পান্থশালায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। জাতক গ্রন্থে আরো জানা যায় রাজা অজাতশত্রু মহাসৎকারে মাতুলের দেহ সৎকার করেছিলেন। রাজকুমার অজাতশত্রু প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্মকে ভালভাবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে বুদ্ধের প্রতি এবং তাঁর ধর্মের প্রতি নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য নিজ রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রে ধর্ম দ্রুত প্রেরণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে বুদ্ধ বিরোধী থাকলেও শেষ জীবনে ভুল বুঝে তার সর্বস্ব ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মের হিত সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয়

Dhaka University Institutional Repository

যে জাতক এমন একটি গ্রন্থ যা প্রাচীন এবং পুরাতনের ইতিহাসে ভরপুর। জাতক একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হবে না। [২৫]

জাতক সাহিত্যের উৎস বিচার

জাতক অর্থ গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্মকাহিনী। তাই সেই অর্থে জাতকের উৎস মূলত বুদ্ধের জন্মকাহিনী। অর্থাৎ জাতক উৎসের মূল স্তম্ভ হলো বুদ্ধের পূর্ব জন্মকাহিনী। তথাগত অনেকবার অর্থাৎ ৫৫০ বার জন্ম নিয়েছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু কখন, কোথায়, কোন প্রক্রিয়ায় ও পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বজন্মের কাহিনীগুলো স্বীয় স্মৃতিতে পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়, এটি সত্যিই চিন্তার বিষয়। কিন্তু এটি অনেকের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয় বলে মনে হতে পারে। আসলে বৌদ্ধ দর্শন মতে এটি সম্যক প্রচেষ্টারই ফল। এ দর্শন মতে কারোর আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে বুদ্ধ হওয়া যায় না, বরঞ্চ নিজের সম্যক প্রচেষ্টা ও সাধনাতেই সব লাভ করা সম্ভব। এ সম্যক প্রচেষ্টার মূল হলো পারমী। তথাগত ভগবান বুদ্ধ পারমী পূরণের দ্বারা জীবনধারাকে ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর করে পারমীর চূড়ান্ত পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তথাগত একবার জন্ম লাভ করেননি। তিনি অসংখ্যবার বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই, পারমী পূরণও একজন্মে সম্ভবপর হয় নি। বহু জন্মের সম্মিলিত কর্মপ্রবাহে এটি সম্ভব হয়। পারমী দশটি। প্রত্যেকটি তিন পর্যায়ে সাধন করতে হয়। এভাবে সর্বমোট পারমী হয় ত্রিশটি। পারমীর এই ত্রিশটি ধারা পূরণকারীর চৈতন্যে উচ্চ মার্গের জ্ঞান প্রবাহের প্রয়োজন হয়। আর এই জ্ঞানকে বলা হয় জাতিস্মর জ্ঞান। এই জাতিস্মর জ্ঞান এমনই একটি জ্ঞান যেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছুই জ্ঞাতব্য হয়। বোধিসত্ত্ব জীবনে পারমী পূর্ণতার সাধনা করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব জীবন জন্ম জন্মান্তরের কর্মপ্রবাহে পরিগ্রহ হয়। তাঁর সাধনা চর্যার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যৌবনে গৃহত্যাগপূর্বক ছয় বছর কঠোর চিত্তবিশুদ্ধি সাধনা দ্বারা পারমী পূর্ণতা অর্জন শেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এবং ঠিক সেই সময়ে তাঁর জাতিস্মর জ্ঞান উদ্ভব হয়েছিল। এজন্য এ জ্ঞানের প্রভাবে যে কোন বিষয়ে চিত্ত মনোনিবেশ করলে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছুই জানা সম্ভব হয়। এভাবে গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভোত্তর জীবনে শিষ্যদের কাছে জাতিস্মর জ্ঞানের মাধ্যমে অতীত জীবনের কাহিনীগুলো ধর্মোপদেশের মাধ্যমে বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তাই জাতকের উৎস হিসেবে আমরা দেখতে পাই গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বকালীন পারমী সাধনার বিভিন্ন প্রকার কাহিনীই। অর্থাৎ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব পূর্ব জীবন কাহিনীই জাতক। [২৬]

বহির্বিশ্বে জাতক সাহিত্যের প্রভাব

জাতকের প্রভাব বহির্বিশ্বেও পরিলক্ষিত হয়। খ্রিষ্ট জন্মের অনেক আগে থেকেই গ্রীক দেশের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং সে সময় কিছু সংখ্যক জাতকের কাহিনী গ্রীক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। [২৭] তাই গ্রীকদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে গ্রীক সাহিত্যে আদি কথাকার ঈষপের নাম। অন্যদিকে ঈষপ কোন ব্যক্তি নন, কিংবা কোথাও কখনও তিনি বিদ্যমান ছিলেন কিনা সেটাও কল্পনাতীত। গ্রীক সাহিত্যে ঈষপের উল্লেখ পাওয়া যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে। হেরোডোটাসের গ্রন্থ খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল এবং এই কথাকার খ্রীষ্টের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জন্ম সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি সেমস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এব য়্যাডমন নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপাখি সম্বন্ধে কথা রচনা করতে করতে তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্য আবিষ্কার হয়েছিল। ঈষপ হঠাৎ একদিন ডেলফাই নগরে নিহত হলেন। তাঁর কথাগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিহাসচ্ছলে লোকচরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা। তৎকালে গ্রীসদেশে অনেকে বিধিবিরুদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করতেন। সম্ভবত এরূপ রাজপদস্থ কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কোন কথা রচনা করেছিলেন বলে ঈষপ তাঁর কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উৎকোচবশীভূত দৈববাণীর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন। কিন্তু প্রচলিত কথাগুলোর মধ্যে কোনটি ঈষপ প্রণীত সেটা কিভাবে প্রমাণ পাওয়া যাবে। খ্রীঃপুঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে বিখ্যাত পণ্ডিত এরিষ্টটল তাঁর অলংকার সংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনৈতিক বক্তৃতায় দু'টি কথা উদ্ধৃত করেছিলেন। একটি অশ্ব ও হরিণের সম্বন্ধে, আরেকটি শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকা সম্বন্ধে। এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি তিনি ষ্টেসিকোবাশ প্রণীত (খ্রীঃপূঃ ৫৫৬) এবং দ্বিতীয়টি ঈষপ কর্তৃক প্রণীত বলে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে দু'টিই ঈষপের নামে প্রচলিত হয়ে আসছে। কিন্তু গ্রীসে আরও অনেক কথা প্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যেও সেগুলি স্থান পেয়েছিল।

এমন অনেক গল্প আছে ঈষপের নামে পরিচিত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে হোক বা অন্য কারণেই হোক না কেন তাদের অধিকাংশই নানা সময়ে নানা ব্যক্তি কর্তৃক রচিত এবং নানা দেশ হতে সংগৃহীত। কিন্তু ঈষপ একজন প্রসিদ্ধ কথাকার ছিলেন এবং কথারচনার জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। এ জনশ্রুতিবশত উত্তরকালে সমস্ত কথাই তাঁর নামে প্রচলিত হয়েছিল। অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচনা বলে গৃহীত, তেমনি অনেক ভাবের বচন যেমন খনার বচন নামে অভিহিত, অনেক উৎকৃষ্ট কথাও সেরূপ ঈষপের রচনা বলে কল্পিত। [২৮] ঈষপের রচনা কল্পিত হলেও তিনি গ্রীক দেশের গ্রীক সাহিত্যে একজন কথাকার হিসেবে সুপরিচিত এবং এক বিশেষ স্থান দখল করে ছিলেন। পণ্ডিতরা তাঁর গল্পগুলোর আখ্যান বলে মনে করেন কারণ তাঁর গল্পের সাথে বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তাঁর গল্প ও গল্পের সাথে সাদৃশ্য বৌদ্ধ জাতকগুলো এখানে তুলে ধরা হলোঃ

বৌদ্ধ জাতক		**ঈষপের গল্প**
১. মুণিক জাতক (৩০)	ষণ্ড ও গোবৎস	(The Ox and the Calf)
২. নৃত্য জাতক (৩২)	কিকি ও ময়ুর	(The Jay and the Peacock)
৩. মশক জাতক (৪৪)	খল্লাট ও মক্ষিকা	(The bald man and the Fly)
৪. সুবর্ণহংস জাতক (১৩৬)	স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসী	(The Goose with the golden Egg)
৫. সিংহচর্ম্ম জাতক (১৮৯)	সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ	(The Ass in a Lions skin)
৬. কচ্ছপ জাতক (২১৫)	কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী	(The Eagle and the Tortoise)
৭. জম্বুজাতক (২৯৪)	কাক ও গৃগাল	(The Crow and the Fox)
৮. জবশকুনজাতক (৩০৮)	নেকড়ে বাঘ ও বক	(The Wolf and the crane)
৯. চুল্লধনুর্গ্রাহজাতক (৩৭৪)	কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব	(The Dog and the shadow)
১০. কুক্কুটজাতক (৩৮৩)	শৃগাল, কুক্কুট ও কুক্কুর	(The Fox, the Cock and the Dog)
১১. দ্বীপি জাতক (৪২৬)	নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক	(The Wolf and the Lamb)

সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে আসেন [২৯] পারস্য সম্রাটের রাজত্বকালে পিথাগোরাস ভারতে এসেছিলেন। তিনি এসে ভারতীয় দর্শন ও জ্যামিতি শিক্ষা অধ্যয়ন করেছিলেন। ঐ সময়ে দরাসুস পাঞ্জাবের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। এর আগে থেকেই পারস্য রাজসভায় ভারতীয় পণ্ডিত ও গ্রীক দার্শনিকদের গতিবিধি ছিল। এভাবে কিছু সংখ্যক জাতকের গল্প

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীকদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অনেকেই ধারণা করেন। কারণ ডেমোক্রিটাস ও প্লেটোর গল্পে জাতকের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীক দেশের সাথে পাক-ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হয়ে যায়। ঐ সময়ে পাশ্চাত্য দেশের সাথে ভারতের মেলামেশার সুযোগ হয়ে যায়। এই যোগাযোগের কারণে বহু জাতকের গল্প পাশ্চাত্য দেশে প্রসারিত হয়।[৩০]

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে খ্রীঃ পূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দীতে ডেমোক্রিটাস বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং প্লেটো বর্ণিত সিংহচর্ম আচ্ছাদিত গর্দভের কথা উল্লেখযোগ্য কারণ এই কথাই আমরা বৌদ্ধ জাতকে দেখতে পাই। কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের কথা চুল্লধনুগ্‌গহ জাতকের রূপান্তর।[৩১]

গ্রীকরা পরবর্তী সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে ভারত ও মিশরের লোকের সাথে বেশ ঘনিষ্ট হয়ে যায়। এভাবে ভারতবর্ষের প্রচলিত কথা মিশরে প্রচলিত হয়ে যায়, এমন কি বৌদ্ধজাতকের কথাও মিশরে প্রচারিত হয়।

ইহুদি সাহিত্যে ও বাইবেলে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাইবেলের পূর্বখণ্ডের রাজা সলোমনের বিচার নৈপুণ্যের কাহিনী মহাউম্মার্গ জাতকের (জাতক নং-৫৪৬) বর্ণিত বোধিসত্ত্বের বিচার নৈপুণ্যের অনুরূপ। মসিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায় যীশুখ্রিষ্ট অতি অল্প খাদ্যে দু'বার ভুরি ভোজন সম্পাদন করেছেন। ইল্লীশ জাতকের (জাতক নং-৭৮) প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে গৌতমবুদ্ধের অল্প খাদ্যে ভুরি ভোজন এর সাথে মিল দৃষ্ট হয়।

খ্রিষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে কিংবা খ্রিষ্টান সমাজে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, তার নাম বার্লাম ও যোয়াসফ। এটি গ্রীক সাধুর ইষ্টধর্মভিত্তিক কাহিনী। রাজা অগবেনের পুত্র যোসেফটের কাহিনী যোন যুদ্ধ কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি।[৩২] ইতালীয় পণ্ডিত কম্পারোজীর মতে সিন্দবাদের আদি পুরুষ মিত্রবিন্দই ছিলেন জাতকে বর্ণিত মিত্রবিন্দক। দিব্যবদানে মিত্রবিন্দক মিত্রকন্যক নামে পরিচিত। অন্যদিকে পণ্ডিত কম্পারোজীর মতে মিত্রবিন্দক ভ্রমণ বিলাসী মিত্রবিন্দক ও সিন্দবাদ অভিন্ন। সিন্দবাদের মতো মিত্রবিন্দক বহুবার সমুদ্র যাত্রা করেন এবং অনেক বিপদের মুখে পতিত হন এবং জাতকের একাধিক গল্পে মিত্রবিন্দকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চতুর্দ্বার জাতক (৪৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপবাসীরা বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয়দের কাছে থেকে গল্প বলা পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন। হয়তোবা এর মধ্যদিয়ে বৌদ্ধজাতক কাহিনীগুলি ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল।[৩৩] মহাকবি চসারের pardoners Tale বৌদ্ধ বেদভজাতকের পাশ্চাত্য রূপমাত্র। দক্ষিণ কারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস কাকার যে সকল কথা শুনে তাঁদের সাথে পঞ্চায়ুধ জাতকের সাদৃশ্য আছে। সেক্সপিয়ার প্রণীত merchant of venice নামক নাটকে অর্দ্ধসের মাংসের এবং পেটিকাত্রয়ের সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধ জাতক হতে আখ্যান গ্রহণ করেছেন। এটি বৌদ্ধ সত্যংকির জাতকের অনুরূপ। [৩৪]

এছাড়া সম্রাট অশোক তৃতীয় সংগীতির পরে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছিলেন শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য। তিনি নিজ কন্যা সংঘমিত্রা ও পুত্র মহিন্দকেও ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহল দেশে প্রেরণ করেন। উক্ত সময়ে সিংহলের রাজা ছিলেন মুটসিবের দ্বিতীয় পুত্র দেবানংপিয়তিস্স। মহিন্দ সিংহলে চুলহত্থিপদোপম সূত্র দেশনা করেছিলেন এবং ঐ দেশনা শ্রবণ করে রাজা স্বয়ং তাঁর অনুচরবৃন্দসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া সিংহলদেশের রাজকুমারী অনুলা থেরী সংঘমিত্রার নিকট্ প্রবজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে অসংখ্য নারী-পুরুষ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মসহ বৌদ্ধ জাতকের গল্প ছড়িয়ে পড়ে।

আরো উল্লেখ পাওয়া যায় ঐ সময়ে ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধের পবিত্র চিতাভস্ম, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র, বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ যার নীচে সম্যক সম্বোধি লাভ করেছিলেন তার একটি শাখা সিংহলের মহামেঘ বনে রোপণ করা হয়েছিল। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেটিকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম করে। এ প্রসঙ্গে ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এখানে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন- "up to this date it flourishes as one of the most sacred objects of veneration and worship for million of Buddhists" এটি মূলত ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি সুসম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। [৩৫] পরবর্তীতে মায়ানমারে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ গমন করেছিলেন। নিম্নব্রহ্মে বা সুবণ্ণভূমিতে সোণ ও উত্তর নামক দু'জন স্থবির এবং উচ্চব্রহ্মে অর্থাৎ অপরান্ত রাষ্ট্রে গিয়েছিলেন যোনকধম্মরকিখত থের।[৩৬] সম্রাট অশোকের সময়কালেই থাইল্যাণ্ডেও প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। একইভাবে সোণ ও উত্তর স্থবিরদ্বয় থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। ব্রহ্মদেশের মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাবধারা সবকিছুই সেখানে প্রচারিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় লাওসে। কথিত আছে কম্বোডিয়ার রাজা জয়বমর্ণ ফানাংকে কম্বোডিয়বাসীকে পালি শাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলার জন্য সিংহল হতে একটি মূর্তি নিজ দেশে নিয়ে আসেন। ফানাং সেই মূর্তিটিকে লাওসের লাংপ্রবাং এ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এভাবে বৌদ্ধধর্ম সেখানকার মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বর্তমান যুগে বৌদ্ধধর্ম লাওসে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মালয়ের কেদার নামক স্থানে একটি ইষ্টক নির্মিত বৌদ্ধচৈত্য আবিস্কৃত হয়েছিল এবং ওয়েলেসাস প্রদেশের উত্তরাংশে কিছু বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন যুক্ত স্তম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বলা যায় যে মালয় উপদ্বীপেও বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ফুনান রাজবংশের রাজা কৌণ্ডিণ্য জয়বমর্ণ এবং রুদ্রদামণ এই দু'জন ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। এছাড়া জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, বোণিও, বালি দ্বীপ [৩৭] প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল এবং তাদের সাহিত্যে, ভাস্কর্য, শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপর পালি সাহিত্যের অনেক প্রভাব ছিল। তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শুধুমাত্র এসব দেশে তাঁদের ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ বাংলা-ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি, ধর্ম, শিল্প, লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের বীজ ঐ সকল দেশেও প্রচার করেন। আর এভাবেই বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম-দর্শনের সাথে পালি জাতকের গল্পও বিভিন্ন জায়গায় প্রসার লাভ করেছিল। পরিশেষে বিশ্বসাহিত্য পর্যালোচনা করলে এতটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, বর্হিবিশ্বে পালি জাতকের যথেষ্ট প্রভাব আছে যা উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায়। উল্লেখিত দেশ সমূহ ছাড়াও তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পালি জাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। [৩৮]

জাতকের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

এই অনুচ্ছেদে জাতকের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব তুলে ধরা হলোঃ উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে জাতকের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং এটি যে একটি প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ সেটাও প্রতিফলিত হয়েছে। জাতক সাহিত্য থেকে আদিম যুগ, ভৌগোলিক পরিবেশ, জনপদ, দেশ জাতি, ধর্ম-বর্ণ এবং নানা ঐতিহাসিক বিবর্তনের নানা ইতিহাস জানা যায়। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতক অধ্যয়নে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সমগ্র পালি জাতক রোমান, ইংরেজী এবং বিশ্বের নানা ভাষায় অনূবাদিত হয়। জাতক গ্রন্থ ইউরোপবাসীদের কাছে এত সমাদর পেয়েছিল যে, তারা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনাতেও জাতকের উপদেশ ও জাতক কাহিনী ব্যবহার করে। নিম্নে পূর্ণ জাতক তুলে ধরা হলোঃ

১. জাতক একটি উপদেশাত্মক গ্রন্থ। জাতক সাহিত্যের অধিকাংশ কথা মহাপুরুষদের এবং এর ভাষা, কথা সমস্ত কিছুই উপদেশমূলক। এ গ্রন্থ যাঁরা পাঠ করে তাঁরা সকলেই আনন্দের সাথে উপদেশ লাভ করে। এই আনন্দমূলক উপদেশ গ্রহণ করার জন্য জাতক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২. জাতক পাঠ করলে সর্বজীবে প্রীতি জন্ম লাভ করে। পৃথিবীতে মানব ধর্মই বড় ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম বলে প্রতিটি জীব বা জীবনকেই আত্মবৎ বিবেচনা করা। ভগবান বুদ্ধ এ যুগে বুদ্ধ হলেও, অতীত যুগে ছিলেন মৃগ, মর্কট, মৎস্য প্রভৃতি জলজ কিংবা স্থলজ প্রাণি। অথচ যে যুগে মৃগ বা মর্কট সে আবার ভবিষ্যৎযুগে পুর্ণেন্দ্রিয় সম্পন্ন হয়ে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করেন। অতএব অদ্যই হোক, আর কল্পনাতেই হোক সমস্ত জীবই এক স্কন্ধসমষ্টিমাত্র এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সকলেই নির্বাণ লাভ করতে পারবে। অতএব এসব উপদেশ এবং দর্শন সম্বর্কীয় উক্তিগুলো জাতকে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যই বলা যায় নির্বাণ লাভের জন্য জাতক সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. জাতক সাহিত্যের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীনকালের রাজনীতি, সমাজনীতি, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। যেমন প্রাচীনকালে ধনী মানুষেরা সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করতেন। সে সময়কার বণিকেরা দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করতে যেতেন। জলপথে জল নিয়ামক ও স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করার সময় স্থলনিয়ামকেরা পথপ্রদর্শন করতেন। জাতক সাহিত্য পাঠে আরো জানা যায় প্রাচীনকালে বালকেরা পাঠশালায় কাষ্ঠফলক তক্তাতে লিখত ও অঙ্ক কষত। সে সময় ভারতবর্ষে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তক্ষশীলা সর্বোকৃষ্ট স্থান ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা হিসাবেও তক্ষশীলার নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে সম্ভ্রান্ত লোকেরা মূল্য দিয়ে দাস ক্রয় করতো অর্থাৎ দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। তখনকার সময়ে শাসনপ্রণালী ছিল রাজতন্ত্র। নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

সুশিক্ষায় শিক্ষা লাভ করতো । অর্থাৎ জাতকে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে জাতকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪. জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের অনেক ইতিবৃত্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল বিম্বিসারকে কন্যা দান করেছিলেন। প্রাচীনভারতে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এ ছয়টি নগরকে সর্বপ্রধান বলে গণ্য করা হতো। জাতক থেকে আরো জানা যায় লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতিভাবে শাসনকার্য্য নির্বাহ করতেন, এমন অনেক ঐতিহাসিক ও মূল্যবান তথ্য জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু থেকে পাওয়া যায়। তাই বিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫. জাতক এমন একটি গ্রন্থ, সেখানে বৌদ্ধ শিল্পেও যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাঁচী বেরুট, বরবুদোরো প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের প্রতিভার যে সকল নিদর্শন আছে সেটা সুন্দরভাবে বুঝতে হলে জাতকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৬. জাতক পাঠে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে এবং বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি স্বরূপ এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো বিশদভাবে পাওয়া যায়। তাই বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জাতক সাহিত্য ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব নয়।

৭. জাতক সাহিত্য এমন একটা গ্রন্থ যেখানে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। তাই জাতক পাঠ করলে বোঝা যায় বৌদ্ধরা সে সময় কিভাবে আনন্দের সাথে কুসংস্কারের বিরোধী হয়েছিলেন। মানুষের মন থেকে কুলষিত, পাপ দূর করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। যার ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

৮. বাংলা ভাষায় শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলেও জাতকের আলোচনা আবশ্যক। বাংলায় এমন অনেক শব্দ আছে যা সংস্কৃতজাত থেকে উদ্ভূত এগুলো আমরা সহজে মূল নির্দ্ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারিনা। কিন্তু পালির সাহায্যে তা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই বাংলা শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ের সুবিধার জন্য ও জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।[৩৯]

৯. জাতক উদান-ত্রিপিটকের বাইরের বিস্তৃত পালি সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে বৈচিত্র্যময় বহু গল্প-কাহিনী ও ইতিহাস।[৪০] এমনকি নানা বৌদ্ধ উপাখ্যানও পাওয়া যায়। সিংহলের গল্প রসবাহিনী পালি ও বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল উপাদান। তাই ড. সুনন্দা বড়ুয়া তাঁর বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থে বলেছেন-"বৈচিত্র্যময় জাতক কাহিনী সুদীর্ঘ রূপকথাধর্মী কাহিনী জাতকের গল্প রসে প্রাণ সঞ্চার করেছে। 'আশঙ্কা' জাতক তেমন এক গল্প কথা"।[৪১]

লোক কাহিনীর মতো চিরাচরিত বহু গল্পের সন্ধানও পাওয়া যায় বলে বলেছেন ড. সুনন্দা বড়ুয়া তিনি ও তাঁর "বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপখ্যান" গ্রন্থে এ বিষয়গুলো অতি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন "জব শকুন জাতক, শশজাতক, মশক জাতক, রোহিনী জাতক, আরাম দূষক জাতক প্রভৃতি বহু উপকথা জাতক কাহিনীতে দেখা যায়"।[৪২] এরকম আরও বহু মূল্যবান মন্তব্য তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পরিশেষে, উপরোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, জাতক সাহিত্য এমন একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি কথা উপদেশমূলক, আনন্দমূলক, ইতিহাস সমৃদ্ধ, পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ, কুসংস্কার বিরোধী অর্থাৎ একটি আদর্শমূলক গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হবে না, যার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার

অতএব, এ অধ্যায়ে জাতক পরিচিতির মধ্যে জাতকের পরিচয়, জাতকের উদ্ভব, জাতকের রচয়িতা ও রচনাকাল, সংগ্রহকাল, গাথা, বর্গ, নাম এবং জাতকের অংশ অর্থাৎ জাতক সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য জানা সম্ভবপর হয়েছে। জাতক একটি ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যবহুল গ্রন্থ। শুধু অভ্যন্তরীণ ইতিহাস-ঐতিহ্য নয়, বলা হবে বিভিন্ন দেশের ও বর্হিদেশের জাতকের প্রভাব সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশনা

১. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ ডক্টর রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৮০, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

২. জাতক সন্দর্শন, প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া; ডিসেম্বর ২০১১, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১৪।

৩. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. সুমনকান্তি বড়ুয়া; ডিসেম্বর ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৩।

৪. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.১৪।

৫. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ. ৪৩।

৬. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৫৫।

৭. জাতকের গল্প ঃ শ্রী গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১।

৮. জাতক স্পন্দন (৪৭৫), দদ্দভ জাতক (৩২২), লটুকিক জাতক (৩৫৭), বৃক্ষধর্ম জাতক (৭৫), সম্মোদমান জাতক (৩৩)।

৯. জাতকের গল্প ঃ পৃ. ২।

১০. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৫৫।

১১. জাতকের গল্প ঃ পৃ. ২-৩।

১২. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ১৮।

১৩. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৫৫।

১৪. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ১৭।

১৫. জাতকের গল্প ঃ পৃ. ৩।

১৬. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ১৭।

১৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫।

১৮. জাতকের গল্প ঃ পৃ. ৪-৭।

১৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৭।

২০. প্রাগুক্ত; পৃ.৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

২১. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. উপক্রমণিকা।

২২. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ. ২১।

২৩. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ উপক্রমণিকা।

২৪. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৬১-২৬৩।

২৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬৩।

২৬. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ১৪-১৫।

২৭. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৬৭।

২৮. জাতকের গল্প ঃ পৃ. ১৬-১৭।

২৯. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; পৃ. উপক্রমণিকা।

৩০. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৬৭।

৩১. জাতকের গল্প ঃ পৃ. ১৭।

৩২. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. উপক্রমণিকা।

৩৩. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৬৯।

৩৪. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. উপক্রমণিকা।

৩৫. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ঃ ড. মণিকুন্তলা হালদার (দে); মহাবোধি বুক এজেন্সী,কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

৩৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭০-৩৭১।

৩৭. প্রাগুক্ত; ৩৭৭-৩৯৪।

৩৮. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৬৯-২৭০।

৩৯. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. উপক্রমণিকা।

৪০. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যানঃ সুনন্দা বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ভূমিকা।

৪১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪২।

৪২. প্রগুক্ত; পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতক সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের নগর সমীক্ষা

ভূমিকা

জাতকে প্রাচীন ভারতবর্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য বহুল বিষয়াদি পাওয়া যায়, তেমনিভাবে গ্রাম, নগর, জনপদ সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধে জাতক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য পালি, সংস্কৃত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্য উপস্থাপন পূর্বক জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করা হবে।

জাতকে নগর ও জনপদ সমীক্ষা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের গ্রাম ও নগর বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল।[১] আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় মানুষ আজ অসাধ্যকে নিজ হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। তেমনি নাগরিক জীবন-যাপন পদ্ধতি অর্থাৎ নগর, গ্রাম এবং জনপদের ক্ষেত্রেও বহু উন্নতি ও আধুনিকতায় পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকালে গ্রাম ও নগরের মধ্যে বহু ব্যবধান ছিল কিন্তু এখন আর আগের মতো সেই ব্যবধান নেই। কারণ আজ গ্রামের মানুষ গ্রামে থেকেই নগর জীবনের সুযোগ সুবিধার বেশীর ভাগই গ্রহণ করছে। কারণ আজ গ্রামেই সবকিছু পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও পরিবেশ ও আধুনিকতার সুযোগ-সুবিধার জন্য মানুষ শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা এখনও পর্যন্ত বহাল আছে। গ্রামের মানুষ শহরে আসার পর মানুষ স্বছন্দে বসবাস করার জন্য বসতবাড়ী স্থাপনার পরিকল্পনা পূর্বে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য শহরে নানা প্রকার আইন প্রণয়নও করা হচ্ছে। তাই শহরমুখী চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল।

পালি সাহিত্য অনুযায়ী প্রাচীন ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে শহর বা নগর চেতনা বিরাজিত ছিল। এর আগে বৈদিক সাহিত্যেও নগর চেতনার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিষ্টীয়

Dhaka University Institutional Repository

১২শ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলে জানা যায়। এ কারণে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতনের বহু ইতিহাস পালি সাহিত্যে আছে যা গ্রাম ও নগর বিষয়ক বহু তথ্য ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] পালি গ্রন্থ দীর্ঘনিকায় থেকে জানা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রাম ও জনপদগুলোর অবস্থান ছিল ঘন। পালি সাহিত্যে যেসব নগর, নগরক, পুর, নিগম, পত্তন, রাজধানী প্রভৃতি বসতি স্থানের নাম পাওয়া যায় সেগুলোকে নগররূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সমস্ত বসতি স্থানের মধ্যে আকার, আয়তন, সুরক্ষা পদ্ধতি এবং ক্রিয়া কর্মের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল।[৩] যাহোক বিভিন্ন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সে সকল গ্রামগুলোর চারপাশে চাষের উপযোগী জমি ছিল। অর্থাৎ গ্রামবাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস ছিল কৃষিকার্য। গ্রামের এই কৃষি নির্ভরতা ও কৃষিগত প্রাণ চরিত্রই সমগ্র বিশ্বে নগর উদ্ভবের পর থেকে গ্রামকে নগর থেকে পৃথক করে রেখেছে। আর প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামে কৃষি কাজ করা হতো। উল্লেখিত সুবর্ণ কর্কট জাতকে (জাতক নং ৩৮৯), মহাকপি জাতকে (জাতক নং-৫১৬), পানীয় জাতকে (জাতক নং-৪৫৯) কৃষিকাজের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাই বর্তমান যুগের মতো প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামে কৃষি কাজের প্রচলন ছিল।

জাতকের আলোকে নগরের উদ্ভব

নগরের উৎপত্তি হওয়ার মূল কারণ হলো দু'টো। এক অর্থনৈতিক। আরেকটি রাজনৈতিক। বিশেষ করে এ দু'টি কারণেই নগর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে নগর বিন্যাস পদ্ধতি ও স্থাপত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পালি সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে নগর বিন্যাস পদ্ধতিতে রাজা, প্রজা, রাজ পরিবারের সদস্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য যে সব লোক নগরবাসী হিসেবে সুপরিচিত তাদের পদবী, আভিজাত্য, অভিরুচি অনুযায়ী স্থপতি ও কারিগরেরা নগর বিন্যাস ও স্থাপত্য নির্মাণ করতেন। সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পরও এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে নগরের নাগরিক সমাজের বসতি স্থাপনায় শাসকের নীতিমালা অনুসরণ করা হতো। এভাবে পালি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নগরগুলো স্থাপত্য ও নগর বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়। এছাড়া স্থাপত্য শিল্পে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা হতো এবং কোন্ আকরে, কোন্ আয়তনে নগরগুলো তৈরি করা হতো তার বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন কুশাবতী নগরের বিস্তৃতি ছিল পূর্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্য ১২ যোজন এবং উত্তর-দক্ষিণে ৭ যোজন। অন্যদিক বারাণসী নগরী ছিল বর্গাকার।

পালি সাহিত্যের নগর সভ্যতা বিশেষ করে মানব সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে নগর প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল নদ-নদী, হিমালয়, সাগর,হ্রদ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, বনানী ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়, শশ, কুণাল, পূতিমাংস, সমুদ্র, বিশন্তর প্রভৃতি জাতক থেকে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৪] তথাগত বুদ্ধের সময় গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গমমূলে গড়ে উঠেছিল পাটলিপুত্র নগর। এছাড়া অনেক প্রকৃতির নাম দিয়ে বহু শহর গড়ে উঠেছিল। যেমন-চম্পক বৃক্ষ হতে চম্পানগরী, কোসম্ব বৃক্ষের নামানুসারে কোসাম্বী নগরী। পালি সাহিত্যে বিভিন্ন নগর ও জনপদের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধিকাংশ নগর ও জনপদের সাথে বুদ্ধ জীবনের ঘটনা জড়িত ছিল এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও প্রসারে এ নগরগুলোর নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পালি সাহিত্যে এ সকল বিষয় অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ছিল বিশাল এবং ঈর্ষণীয়। এসব নগর ও জনপদ আবিষ্কার করার জন্য কাণিংহাম এসেছিলেন।

জাতকে উল্লেখিত নগর সমীক্ষা

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের নগর, গ্রাম, জনপদ এবং নাগরিক জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়।[৫] প্রাচীনকালে নগরের সংখ্যা প্রচুর ছিল। মহাসুদস্সন সুত্ত হতে জানা যায় তথাগত বুদ্ধ নিজে ভারতবর্ষে চুরাশি হাজার নগর উৎপত্তি হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরবর্তী সময় পালি গ্রন্থ মহাবংস হতে জানা যায় সম্রাট অশোকের সময় প্রাচীন ভারতে ৮৪ হাজার নগর ছিল। তবে ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

হাজার নগরের সন্ধান পাওয়া না গেলেও ১৪৯ টি প্রধান প্রধান নগরের নাম জাতক ও অন্যান্য পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো দেয়া হলোঃ

১. অনুপ্রিয় (সুখবিহারী জাতক, জাতক নং-১০)।

২. অন্দপুর (সেরিবাণিজ জাতক, জাতক নং-৩)।

৩. অরিট্ঠপুর (উন্মাদয়ন্তী জাতক, জাতক নং-৫২৭)।

৪. অসিতঞ্জন (ঘটজাতক, জাতক নং-৪৫৪)।

৫. অস্পুর (চেদি জাতক, জাতক নং-৪২২)।

৬. আলবী (ত্রিপর্য্যস্ত মৃগ জাতক, জাতক নং-১৬)।

৭. ইন্দ্রপ্রস্থ (বিদূরপণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

৮. উজ্জেনি (শরভঙ্গ জাতক, জাতক নং-৫২২)।

৯. উত্তর পঞ্চাল (জয়দ্দিূষ জাতক, জাতক নং-৫১৩)।

১০. উপকারী (মহাউন্মার্গ জাতক, জাতক নং-৫৪৬)।

১১. কজঙ্গল (কপোত জাতক, জাতক নং-৩৭৫)।

১২. কপিলবতথু (সম্মোদমান জাতক, জাতক নং-৩৩)।

১৩. কাম্পিল্য (কুম্ভকার জাতক, জাতক নং-৪০৮)।

১৪. করম্বিয় (পাণ্ডর জাতক, জাতক নং-৫১৮)।

১৫. কালচম্পা বিদূরপণ্ডিত জাতক (জাতক নং-৫৪৫)।

১৬. কাসিপুর (মহাজনক জাতক জাতক নং-৫৩৯)।

১৭. কিম্বিল (নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

১৮. কুককুট (কুক্কুট জাতক, জাতক নং-৩৮৩)।

১৯. কুণ্ডিয় (অশাতরূপ জাতক, জাতক নং-১০০)।

২০. কুম্ভবতী (ইন্দ্রিয় জাতক, জাতক নং-৪২৩)।

২১. কুসাবতী (মহাসুদর্শন জাতক, জাতক নং-৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

২২. কেকক (সংকৃত জাতক, জাতক নং-৫৩০)।

২৩. কেতুমতী (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

২৪. কোসম্বী (সুরাপান জাতক, জাতক নং- ৮১)।

২৫. উরুবেলকস্প (জাতক ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬)।

২৬. থানুমৎ নগর (মহাউন্মার্গ জাতক, জাতক নং-৫৪৬)।

২৭. থূণা নগর (মহাজনক জাতক, জাতক নং-৫৩৯)।

২৮. চন্দবতী (লোমশকাশ্যপ জাতক, জাতক নং-৪৩৩)।

২৯. চম্পা (চাম্পেয় জাতক, জাতক নং-৫০৬)।

৩০. জেতুত্তর (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

৩১. তক্কসীলা (নন্দিবিলাস জাতক, জাতক নং-২৮)।

৩২. দদ্দর (চেদি জাতক, জাতক নং-৪২২)

৩৩. দন্তপুর (শরভঙ্গ জাতক, জাতক নং-৫২২)।

৩৪. দেবদহ (জাতক ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫)।

৩৫. দেসক (তৈলপাত্র জাতক, জাতক নং-৯৬)।

৩৬. দ্বারবতী (মহাউন্মার্গ জাতক, জাতক নং-৫৪৬)।

৩৭. নালকপান (নলপান জাতক, জাতক নং-২০)।

৩৮. পাবা (জাতক ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮)।

৩৯. পুপ্ফবতী (খণ্ডহাল জাতক, জাতক নং-৫৪২)।

৪০. পোতলি নগর (খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১)।

৪১. ভেণ্ণাকট নগর (মহানারদকাশ্যপ জাতক, জাতক নং-৫৪৪)।

৪২. বন্ধুমতী (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

৪৩. বারাণসী (অপণ্ণক জাতক, জাতক নং-১)।

৪৪. বৈশালী (খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১)।

৪৫. ব্রহ্মবর্দ্ধন (শোণনন্দ জাতক, জাতক নং-৫৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. মধুরা (মথুরা) (ঘট জাতক, জাতক নং-৪৫৪)।

৪৭. মাহিসসতি (শরভঙ্গ জাতক, জাতক নং-৫২২)।

৪৮. মিথিলা (মখাদেব জাতক, জাতক নং-৯)।

৪৯. রাজগৃহ (লক্ষণ জাতক, জাতক নং-১১)।

৫০. সাকেত (সাকেত জাতক, জাতক নং-৬৮)।

৫১. সাগল (কুশ জাতক, জাতক নং-৫৩১)।

৫২. শ্রাবস্তী (বাতমৃগ জাতক, জাতক নং-১৪)।

৫৩. সীহপুর (চেদি জাতক, জাতক নং-৪২২)।

৫৪. সুদস্সন (খুল্লসুতসোম জাতক, জাতক নং-৫২৫)।

৫৫. সুরুন্ধন (উদয় জাতক, জাতক নং-৪৫৮)।

৫৬. সোত্থিবতী (চেদি জাতক, জাতক নং-৪২২)।

৫৭. সোভিত (বিদূরপণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

৫৮. হত্থিপুর (চেদি জাতক, জাতক নং-৪২২)।

৫৯. সৌবীর দেশ (আদীপ্ত জাতক, জাতক নং-৪২৪)।

৬০. সিন্ধুদেশ (কুক্কুর জাতক, জাতক নং-২২)।

৬১. কংসভোগ নামক দেশ (ঘটজাতক, জাতক নং-৪৫৪)।

৬২. মোলিনী নগর (শঙ্খ জাতক, জাতক নং-৪৪২)।

৬৩. রম্য নগর (যুবঞ্জয় জাতক, জাতক নং-৪৬০)।

৬৪. শকুল নগর (খুল্লহংস জাতক, জাতক নং-৫৩৩)।

৬৫. বিদেহ নগর (মহাজনক জাতক, জাতক নং-৫৩৯)।

৬৬. দেব নগর (কুলায়ক জাতক, জাতক নং-৩১)।

৬৭. রৌরব নগর (আদীপ্ত জাতক, জাতক নং-৪২৪)।

৬৮. কুসিনারা (ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ১৪৫)।

৬৯. যক্ষ নগর (বালাহাশ্ব জাতক, জাতক নং-১৯৬)।

Dhaka University Institutional Repository

৭০. অনোপম
৭১. অনোম
৭২. অম্বসণ্ডা
৭৩. অমরবতী
৭৪. অযোজঝা
৭৫. অরুণবতী
৭৬. অলসন্দা
৭৭. আটানাটা
৭৮. আতুমা
৭৯. আপণ
৮০. আলকমন্দা
৮১. উক্কটঠ
৮২. উজুঞ্ঞা
৮৩. উত্তর
৮৪. উলুম্প
৮৫. ত্ররকচ্ছ
৮৬. কক্রপত্ত
৮৭. কণ্নকুজ্জ
৮৮. কাপীবন্তা
৮৯. কমমাস্দম্ম।
৯০. কাবীর
৯১. কুররঘর
৯২. কুসঘর
৯৩. কুসিনাটা
৯৪. অগ্গলপুর
৯৫. কেসপুত্ত
৯৬. খেমবতী
৯৭. খোমদুসস
৯৮. গয়া
৯৯. চন্দকপ্প
১০০. জনোঘ
১০১. তক্করা
১০২. তগর
১০৩. থুল্লকোট্ঠিত
১০৪. দণ্ডকপ্পক
১০৫. ধঞ্ঞবতী
১০৬. নগর
১০৭. নঙগরক
১০৮. নালন্দা
১০৯. পঙকধা
১১০. পতিটঠান
১১১. পরকুসিনাটা
১১২. পাটলিপুত্ত
১১৩. পোতন
১১৪. বনস
১১৫. বরণা
১১৬. বেত্তবতী
১১৭. বেঙলিঙ্গম
১১৮. বেভার
১১৯. বেরঞ্জা
১২০. ভদ্দবতীকা
১২১. ভদ্দিয়নগর
১২২. ভরুকচ্ছ
১২৩. মচ্ছিকাসণ্ড
১২৪. মন্তাবতী
১২৫. মেখলা
১২৬. মেদলুম্প
১২৭. রম্মক
১২৮. রমমবতী
১২৯. বোরুক
১৩০. লম্বচুলক
১৩১. সকখর
১৩২. সঙকসস
১৩৩. সজ্জনেল
১৩৪. সরণ
১৩৫. সহজাতি
১৩৬. সাপূগ
১৩৭. সুধঞ্ঞ
১৩৮. সুধমমবতী
১৩৯. সুপপারক
১৪০. সুমঙ্গল
১৪১. সুংসুমারগিরি
১৪২. সেতকণ্নিক
১৪৩. সেতব্যা
১৪৪. সোভন
১৪৫. সোভবতী
১৪৬. সোরেয্য
১৪৭. হলিদ্দবসন
১৪৮. হংসবতী
১৪৯. অটঠক নগর।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত নগরগুলোর নামোল্লেখ শুধুমাত্র একটি জাতকেই পাওয়া যায় তা নয়। একাধিক জাতকে এসব নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু জাতকের নাম দেওয়া হলোঃ

১। কোসম্বী (ত্রিপর্য্যন্ত মৃগ জাতক, জাতক নং-১৬, দৃঢ়ধর্ম্ম জাতক, জাতক নং-৪০৯, কোসম্বী জাতক, জাতক নং-৪২৮, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জাতক, জাতক নং-৪৪৪)

২। তক্ষশিলা (অশাতমন্ত্র জাতক, জাতক নং-৬১, বরুণ জাতক, জাতক নং-৭১, সারম্ভ জাতক, জাতক নং-৮৮, ভীমসেন জাতক, জাতক নং-৮০, নামসিদ্ধিক জাতক, জাতক নং- ৯৭)।

৩। বারাণসী (তক্ষকশূকর জাতক, জাতক নং-৪৯২, মহাবাণিজ জাতক, জাতক নং-৪৯৩, ভিক্ষাপারম্পর্য্য জাতক, জাতক নং-৪৯৬, মাতঙ্গ জাতক, জাতক নং-৪৯৭, রোহন্তমৃগ জাতক, জাতক নং-৫০১)।

৪। মিথিলা (সুরুচি জাতক, জাতক নং-৪৮৯, স্বাধীন জাতক, জাতক নং-৪৯৪, মহাজনক জাতক, জাতক নং-৫৩৯, নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১, বিনীলক জাতক, জাতক নং-১০৬)।

৫। রাজগৃহ (শঙ্খপাল জাতক, জাতক নং-৫২৪, শোণক জাতক, জাতক নং-৫২৯, বাতমৃগ জাতক, জাতক নং-১৪, ইল্লীস জাতক, জাতক নং-৭৮, অসম্পদান জাতক, জাতক নং-১৩১)।

৬। শ্রাবস্তী (অপণ্ণক জাতক, জাতক নং-১, কুম্ভ জাতক, জাতক নং-৫১২, মাংস জাতক, জাতক নং-৩১৫)।

৭। ইন্দ্রপ্রস্থ (দশব্রাক্ষণ জাতক, জাতক নং-৪৯৫, মহাসুতসোম জাতক, জাতক নং-৫৩৭, কামনীত জাতক, জাতক নং-২২৮, ধূমকারী জাতক, জাতক নং-৪১৩, কুরুধর্ম্ম জাতক, জাতক নং-২৭৬, সম্ভব জাতক, জাতক নং- ৫১৫।

৮। উত্তর পঞ্চাল (শক্তিগুল্ম জাতক, জাতক নং-৫০৩, সৌমনস্য জাতক, জাতক নং-৫০৫, কামনীত জাতক, জাতক নং-২২৮, ব্রহ্মদত্ত জাতক, জাতক নং-৩২৩, গণ্ডতিন্দু জাতক, জাতক নং-৫২০)।

Dhaka University Institutional Repository

৯। কাম্পিল্য (ব্রহ্মদত্ত জাতক, জাতক নং-৩২৩, মহাউন্মার্গ জাতক, জাতক নং-৫৪৬, জয়দ্দিষ জাতক, জাতক নং-৫১৩, গণ্ডতিন্দু জাতক, জাতক নং-৫২০)।

১০। দন্তপুর (কুরুধর্ম্ম জাতক, জাতক নং-২৭৬, কালিঙ্গবোধি জাতক, জাতক নং-৪৭৯, খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১)।

১১। কুশাবতী, জাতক ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫, কুশ জাতক, জাতক নং-৫৩১।

১২। দদ্দর (চেদী জাতক, জাতক নং-৪২২, দর্দ্দর জাতক, জাতক নং-১৭২, শৃগাল জাতক, জাতক নং ১৫২)।

১৩। কালচম্পা (মহাজনক জাতক, জাতক নং-৫৩৯)।

১৪। সাকেত (নন্দিকমৃগ জাতক, জাতক নং-৩৮৫, শতধর্ম্মা জাতক, জাতক নং-১৭৯, সাকেত জাতক, জাতক নং-২৩৭, মহানারদকাশ্যপ জাতক, জাতক নং-৫৪৪)।

১৫। কপিলবস্তু (জাতক ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫, সংগ্রামাবচর জাতক, জাতক নং- ১৮২, কৃষ্ণ জাতক, জাতক নং- ৪৪০, বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

১৬। আলবী (জাতক ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪, মণিকণ্ঠ জাতক, জাতক নং-২৫৩)।

১৭। বৈশালী (খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১, একপর্ণ জাতক, জাতক নং-১৪৯, শৃগাল জাতক, জাতক নং-১৫২, তেলোবাদ জাতক, জাতক নং-২৪৬)।

১৮। কিম্বিল (সুখবিহারী জাতক, জাতক নং-১০, জাতক ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫, নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

প্রধান প্রধান নগরের বর্ণনা

অনোম

জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের এক সমৃদ্ধশালী নগর। এ নগরটি প্রখ্যাত রাজা সুদিন্নার রাজধানী ছিল। এ রাজা ছিলেন তথাগত বুদ্ধের পূর্বকালীন ভারতবর্ষের রাজা। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

এ নগরে অতীত বুদ্ধ পিয়দস্সী জন্মলাভ করেছিলেন। প্রাচীন পালি গ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এ নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে এ নগরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[৭]

অন্দপুর

সেরিবাণিজ জাতকে [৮] এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নগর ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ নগরটি সেরিরাজ্যের তেলবাহ নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন জাতক অনুসারে অন্দপুর ছিল অন্ধ্রদেশের রাজধানী। এ অন্ধ্রদেশটি একসময় সেরিরাজ্য এবং তেলনগিরি নদীটি তেলবাহ নামে পরিচিত ছিল। পালি সাহিত্যে এ নগরের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কারণে প্রাচীনকালে এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়।

অমরবতী

জাতক ও বুদ্ধবংস থেকে উল্লেখ পাওয়া যায়, অমরবতী নগরটি ছিল দীপংকর বুদ্ধের জন্মস্থান। এছাড়াও এখানে চব্বিশ জন সম্যক সম্বুদ্ধ জন্মলাভ করেছিলেন তন্মধ্যে দীপংকর ছিলেন আদি বুদ্ধ। তথাগত ভগবান বুদ্ধ অমরবতীতে জন্মলাভ করেন এবং সুমেধ তাপস নামে খ্যাতি লাভ করেন। সুমেধ তাপস দীপংকর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করে বোধিলাভ করেন এবং বোধিসত্ত্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন। অমরবতী নগরটির বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করলে এবং জাতক সাহিত্যের উল্লেখ থেকে মনে হয় প্রাচীন ভারতবর্ষের এটি প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। [৯]

অরিট্ঠপুর

এই নগরটি সিবি জাতকে [১০] এবং সিবিরাজ্যের রাজধানী। অরিট্ঠপুর উত্তর ভারতের পাঞ্জাবের শোরকোঠ অঞ্চলে অবস্থিত। উম্মাদয়ন্তী জাতক থেকে [১১] উল্লেখ পাওয়া যায় যে, উম্মদয়ন্তী নাম্মী এক রূপসীর জন্মস্থান। তিনি ছিলেন সর্বলক্ষণ প্রতিমণ্ডিতা। এ নগরীতে রাজা উসিনারা এবং তার পুত্র সিবির উল্লেখ আছে। কিন্তু সিবি রাজ্যের সাথে সিবি রাজকুমারের এবং সিবির জনগণের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সেটি জানা যায় নি। এটি জাতকের একটি প্রাচীনতম এবং জনবহুল নগরী।

Dhaka University Institutional Repository

জেতুত্তর

বর্তমান উত্তর ভারতের রাজপুতনায় অবস্থিত। বিশন্তর জাতকে (জাতক নং-৫৪৭) এ নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বিশন্তর জাতক অনুসারে জেতুত্তর নগরী ছিল শিবিরাষ্ট্রের রাজধানী। জানা যায় রাজা শিবি এবং সঞ্জয় এ নগরের শাসককর্তা ছিলেন। রাজা সঞ্চয়ের স্ত্রী পূষতী দেবী বৌদ্ধ ধর্মের জন্য প্রচুর দান করতেন এবং তিনি দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রাচীন পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এ নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের এক প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী নগরী ছিল। [১২]

কাসিপুর

কাসিপুর বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের বেনারস নামে পরিচিত। পালিতে কাসিপুর এবং সংস্কৃতে কাশিপুর বলা হয়। ভুরিদত্ত জাতকে [১৩] কাসিপুর নগরের নাম পাওয়া যায় এবং এটি একটি সমৃদ্ধ নগরী। এ নগরীতে অতীত বুদ্ধ ফুস্স জন্মলাভ করেছিলেন। বর্তমানে এ নগরটি কাসিক বা কাসিপুরী নামেও পরিচিত। এ নগরের আরেক নাম বারাণসী। তথাগত ভগবান বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর ধর্ম প্রচারের জন্য বারাণসীতে গমন করেছিলেন। প্রাচীন পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের এক প্রাচীনতম নগরী। [১৪]

কুণ্ডিয়

বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলায় অবস্থিত। অসাতরূপ জাতক[১৫] থেকে জানা যায় এ জনপদের অবস্থান ছিল কোলিয় রাজ্যে। ভগবান বুদ্ধ এ নগরের কুণ্ডধাবনে অবস্থান করে ধর্ম দেশনা করেছিলেন। এছাড়াও কোলিয় রাজকন্যা সুপ্রবাসা সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছিলেন। বিভিন্ন পালিগ্রন্থে এবং জাতক সাহিত্যে এ জনপদের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া এ জনপদটি প্রাচীন ভারতবর্ষের জনবহুল নগরী। [১৬]

দদ্দর

বর্তমানে মধ্যভারতের এক অঞ্চলে দদ্দর অবস্থিত। চেতিয় জাতক অনুসারে এটি চেতি রাজ্যের এক প্রসিদ্ধ নগরী। এ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিল চেতিরাজ উপচরের পঞ্চম পুত্র। জানা যায়, এ রাজার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

পর্বতের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যার ফলে দুই পর্বতের মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। যা থেকেই নগরটির নাম হয়েছে দদ্দর। যাহোক বিভিন্ন নামের উৎপত্তি এবং জাতক সাহিত্যে নামোল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জনপদ। এ কারণে বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। [১৭]

দেসক

প্রাচীন এই নগরটি বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর জেলায় অবস্থিত। এ নগরটির নাম তেলপত্ত জাতকে[১৮] পাওয়া যায়। এটি সুম্ভরাষ্ট্রের একটি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ নগরী। কিছু কিছু জায়গায় দেসককে আবার সেদক বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। জানা যায় তথাগত ভগবান বুদ্ধ দেসক নগরীতে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এ নগরটির উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারবর্ষের প্রাচীনতম নগরী যার বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

তক্কসীলা

বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল তককসীলা। সংস্কৃতে তক্ষশীলা বলে। পালি সাহিত্য ও জাতক অনুসারে বৌদ্ধ যুগের এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান অর্থাৎ শিক্ষা কেন্দ্রিক নগরী। এটি এমন এক শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী আগমন করতো । তক্ষশীলার বিদ্যার্থী অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে শিক্ষা দান করতেন। এ নগরটি গান্ধার রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। রাজা পুক্কুসাতি ছিলেন গান্ধারের রাজা। তিনি ছিলেন তথাগত বুদ্ধের সমসাময়িক।[১৯] কুম্ভকার জাতকেও[২০] তক্ষশীলার নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে জানা যায় এটি নগ্গজি নামক রাজার রাজধানী ছিল। প্রাচীন পালিগ্রন্থ এবং বিভিন্ন জাতকে এ নগরটির নাম পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের এক প্রভাবশালী এবং সমৃদ্ধশালী প্রসিদ্ধ জনপদ। বর্তমানেও নগরটি প্রাণবন্ত অবস্থায় আছে বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পুপ্‌ফবতী

বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। পুপ্‌ফবতী প্রাচীন কাসিরাজ্যের রাজধানী। এটি বারাণসীর অন্য একটা নাম। এটি খণ্ডহাল জাতকের [২১] একটি প্রসিদ্ধ নগরী। প্রাচীন গ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এ নগরের নামোল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের এক প্রাচীনতম জনপদ।

বারাণসী

এটির অবস্থান অধুনা ভারতের উত্তর প্রদেশে। বারাণসী আবার বেনারস নামে বিখ্যাত। এই নগরটি কাসী বা কাসীর রাজ্যের রাজধানী ছিল। এ নগরটি শুধুমাত্র বেনারস নামেই বিখ্যাত ছিল না। পালি সাহিত্যে হস্তিপাল জাতকে (জাতক নং-৫০৯) এবং জাতক সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় বারাণসীর নাম পাওয়া যায়। এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগরী। বর্তমানে নগরটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলে জানা য়ায়। [২২]

দ্বারবতী

প্রাচীন নগর দ্বারবতী বর্তমান ভারতের গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত। দ্বারবতী কম্বোজের রাজধানী। বর্তমানে নগরটি দ্বারকা নামে পরিচিত।[২৩] ঘটজাতক[২৪] হতে জানা যায় দ্বারবতী ছিল অন্ধক বিষ্ণু দাসের ৯ জন পুত্রের রাজধানী। ঘটজাতক অনুসারে ৯জন পুত্রের নাম হলো বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, বরুণদেব, অর্জুন, পর্জন, ঘটপণ্ডিত ও অংকুর। এছাড়া আরো জানা যায় প্রাচীনকালে নগরটি সিবি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সিবি রাজা কর্তৃক নগরটি শাসিত হয়েছিল। প্রাচীন পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। বর্তমানে জনপদটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। [২৫]

নগর

এটি বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধরের কৈর জেলায় অবস্থিত।[২৬] কুসজাতক [২৭] অনুসারে নগর মদ্ররাজ্যের রাজধানী। মিলিন্দপ্রশ্ন [২৮] থেকে জানা যায় মদ্রদেশের রাজধানী হলো সাগল। মতামতের উপর ভিত্তি করে মনে হয় নগর জনপদটি ছিল প্রাচীন রাজধানী পরবর্তীতে এর গুরুত্ব হারালে সাগল গ্রীক রাজাদের অধীনস্থ হয় এবং রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম জনপদ। তৎকালে যার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল বলে জানা যায়। [২৯]

Dhaka University Institutional Repository

ভরুকচ্ছ

এটির অবস্থান প্রাচীন ভরুদেশে এবং পশ্চিম ভারতের গুজরাট প্রদেশে বর্তমানে ভারচু নামে পরিচিত। ভরুজাতক [৩০] এবং সুপ্পারক [৩১] জাতক হতে জানা যায় ভরুকচ্ছ ছিল ভরুদেশেরই এক প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ সমুদ্রবন্দর নগরী। জাতক সাহিত্যে গ্রন্থটির নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং অনুমান করা যায় যে এটি একটি প্রাচীতম জনপদ তৎকালে যার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। [৩২]

মধুরা

বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশে মধুরার অবস্থান। মধুরার বর্তমান নাম মথুরা। সংস্কৃতে মথুরা বলা হয়। এ মথুরাই সুরসেন জনপদের রাজধানী। প্রাচীন ভারতবর্ষে তথাগত ভগবান বুদ্ধের সময় মধুরা উত্তর ও দক্ষিণ এ দুই অংশে বিভক্ত ছিল। জানা যায় সেই সময়ে মধুরাজ অবন্তিপুত্ত উপাধি ধারণ করতেন। মথুরা জনপদটি ছিল বুদ্ধের অন্যতম প্রধান এক শিষ্য মহাকচ্চানের জন্মস্থান।[৩৩] ঘটজাতক [৩৪] থেকে জানা যায়, উত্তর মথুরার রাজা মহাসাগর যাদবদেরকে আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করে মথুরা দখল করেন, যার ফল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

মধুরা সংস্কৃত। যার উৎপত্তি 'মধুপুর বা মধুপুরা' থেকে। আবার গ্রীকদের কাছে 'মেথোর ও মোদোউরা'। চীনাদের কাছে মত-ওউ-লো কিংবা মো-তু-লো নামে পরিচিত।[৩৫] এ জনপদেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং এ নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত গ্রন্থ রামায়ণ হতে জানা যায় তৎকালে নগরটি মধুবন নামে পরিচিত ছিল। ঠিক সেই সময়ে প্রধান এক দৈত্য (যজ্ঞ) তার পুত্র লবণ রাজত্ব করতেন। পরবর্তীতে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন লবণকে পরাজিত করে এবং মধুবনের জঙ্গল পরিস্কার করে নগরটি প্রতিষ্ঠিত করেন। পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে মধুরার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি জনবহুল জনপদ। বর্তমানেও এটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। [৩৬]

রম্মক

রম্মকের অবস্থান বর্তমান উত্তর ভারতে। রম্মক বেনারস নামে পরিচিত। জাতকে রম্মকের নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং বেনারসের প্রাচীন নাম। প্রাচীন পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে রম্মক নগরের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে উববিদ্ধ নামক এক প্রখ্যাত রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসারে রম্মক একটি প্রাচীনতম জনপদ। পরবর্তীতে এই জনপদটি রম্প নামে পরিচিত হয়।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

সরণ

সরণ বর্তমান ভারতেই অবস্থিত। জাতক এবং বুদ্ধবংস হতে জানা যায় অতীত বুদ্ধ ধম্মদস্সী এখানে জন্মলাভ করেছিলেন। সরণের নাম প্রাচীনগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি পবিত্র জনপদ। [৩৮]

সীহপুর

বর্তমান ভারতের বুন্দেলখণ্ড নিয়ে সীহপুর অবস্থিত। চেদি জাতক (জাতক নং-৪২২) থেকে জানা যায় এটি চেতি রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগরী। এ নগরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাসম্মত বংশের রাজা উপচরের তৃতীয় পুত্র। এটির উল্লেখ শুধুমাত্র জাতক সাহিত্যেই নয় সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যার সীহপুরের যথেষ্ট প্রাচীনত্ব আছে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। [৩৯]

রম্মবতী

বর্তমান ভারতেই রম্মবতীর অবস্থান। রম্মবতী জাতকে এ নগরের নাম পাওয়া যায় এবং এটি ছিল এক পবিত্র নগরী এবং এখানেই অতীত বুদ্ধ দীপংকর ও কোণ্ডাঞ্ঞ জন্মলাভ করেন। বুদ্ধবংস, অপদান এবং জাতক সাহিত্যে রম্মবতীর নামোল্লেখ থেকে মনে হয় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ।[৪০]

লম্বচুলক

এটির অবস্থান মধ্য ভারতেই। সরভঙ্গ জাতক [৪১] হিসেবে এটি অবন্তী রাজ্যের প্রসিদ্ধ নগরী। একদা এ রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করতেন রাজা চণ্ডপজ্যোত অর্থাৎ তিনি ছিলেন অবন্তীর রাজা। চণ্ডপজ্যোত ছিলেন তথাগত ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন। প্রাচীন সাহিত্যে এবং জাতক সাহিত্যের উল্লেখ থেকে মনে হয় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ এবং এটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[৪২]

সকুল

বর্তমান দক্ষিণ ভারতের মহিশুরে অবস্থিত। চুল্লহংস জাতক [৪৩] থেকে জানা যায় সকুল মহিংসক রাষ্ট্রের এক প্রসিদ্ধ নগরী। এ নগরটির উল্লেখ জাতক এবং পালি গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। এবং অনুমান করা যায় এটি প্রাচীনতম জনপদ।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

সুদসসন

এর অবস্থান বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশে। সুতসোম জাতক [৪৫] থেকে জানা যায় এটি প্রাচীন ভারতের পবিত্র নগরী। এখানে অতীত বুদ্ধ সুমেধ জন্মলাভ করেন। এ নগরটি বর্তমানে বেনারস নামে পরিচিতি এবং এটি বেনারসের ভিন্ন নাম। প্রাচীন গ্রন্থ এবং জাতক অনুসারে এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ।

সুরুন্ধন

বর্তমানে অধুনা ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। উদয় জাতক [৪৬] থেকে জানা যায় এটি কাসি জনপদের একটি প্রসিদ্ধ নগরী। সুরুন্ধনকে বারাণসীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বারাণসী আবার বর্তমানে বেনারস নামে পরিচিত। এটি জাতক সাহিত্যে উল্লেখিত এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের জনবহুল জনপদ।

সোত্থিবতী

এটি বর্তমান ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। চেতিয় জাতক থেকে জানা যায় এটি সোত্থিবতীর রাজধানী চেতি বা চেদি রাজ্য। সংস্কৃত মহাকাব্য থেকে জানা যায় উল্লেখিত সুকতিমতি নগরের সাথে অভিন্ন। প্রাচীন পালিগ্রন্থ, সংস্কৃত গ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এ নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। [৪৭]

ইন্দপত্ত

এর অবস্থান দিল্লীর দুই মাইল দক্ষিণে যমুনা নদীর তীরবর্তী। বর্তমানে ইন্দ্রপস্থ বা ইন্দপত্ত নামে পরিচিত। এ জনপদটি কুরুরাজ্যের রাজধানী হিসেবে সুপরিচিত।[৪৮] ধূমকারী [৪৯] এবং দসব্রাহ্মণ [৫০] জাতক হতে জানা যায় ইন্দ্রপস্থের শাসনকর্তা ছিলেন যুধিষ্ঠিরের বংশধর। এ নগরটি ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রধান তিন নগরের মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধবংস হতে জানা যায় এ নগরেই ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত সূঁচ এবং ক্ষুর সংরক্ষিত ছিল। উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও জাতক অনুসারে এটি একটি প্রাচীন জনপদ। [৫১]

কম্মাসদম্ম

বর্তমানে উত্তর ভারতের থানেশ্বরে অবস্থিত। কম্মাসদম্ম দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থের সতিপট্ঠান সুত্ত এবং অঙ্গুত্তর নিকায় অনুযায়ী এটি কুরুরাজ্যেরই এক পবিত্র নগর। [৫২] মহাসুতসোম জাতক [৫৩] ও অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ হতে জানা যায়, যে স্থান পারিসাদ নামক সজ্ঞ দমিত হয়, সেস্থানে একটি নিগম প্রতিষ্ঠার পরে নাম হয় মহাকমমাসদম্ম। পরবর্তীতে এটি প্রতিষ্ঠিত জনপদ এবং গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল বলে জানা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন গ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্য অনুসারে এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ।

উপকারী

এই নগরটি উত্তর ভারতের রোহিলাখণ্ডে অবস্থিত [৫৪] এবং মহাউম্মার্গ জাতক [৫৫] অনুসারে এটি পঞ্চাল রাজ্যের নগরী। এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ নগরী এবং প্রাচীনকালে এ নগরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং উল্লেখিত জাতকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বলে কথিত।

কালচম্পা

এটি বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের ভাগলপুরের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত [৫৬] মহাজনক জাতক [৫৭] হতে জানা যায় কালচম্পা নগরটি অঙ্গ জনপদেরই এক সমৃদ্ধ নগরী। প্রাচীন গ্রন্থেও কালচম্পার নাম পাওয়া যায়। এটি অঙ্গের রাজধানী। পরবর্তীতে চম্পার বর্ধিত নাম বিভিন্ন পালিগ্রন্থে এবং জাতক সাহিত্যে চম্পার স্থানে কালচম্পার নাম পাওয়া যায়। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অটঠকথায় সোণকোলিবিস নামক এক ভিক্ষুর জন্মস্থান কালচম্পায়। কিন্তু থেরীগাথার অটঠকথায় তাঁর জন্মস্থান পাওয়া যায় চম্পানগর প্রাচীন গ্রন্থে ও পালি গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ নগরী এবং এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। [৫৮]

কাবীর

বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জাভুর জেলার কাবেরা নদীর তীরবর্তী।[৫৯] অকিত্তি জাতক [৬০] অনুসারে কাবীর প্রাচীন দমিল দেশের সমুদ্রবন্দর নগরী। এছাড়াও ধম্মপদ্যাট্ঠকথা হতে আরো উল্লেখ পাওয়া যায় লকুন্টক অতিস্বরের স্ত্রী সুমনা কাবীর এই নগরের নাবিক পরিবারে জন্মলাভ করেন। [৬১]

কেকক

এটির অবস্থান বর্তমান ভারতেই। কামনীত জাতক (জাতক নং-২২৮) অনুযায়ী জম্বুদ্বীপের প্রধান নগরী। বর্তমানে কেকয় বা কেক নামেও বিশেষ পরিচিত। এই নগরের অধিবাসীরা কেককা নামে

Dhaka University Institutional Repository

সুপরিচিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে এবং জাতক সাহিত্যের এক প্রাচীনতম জনপদ এবং এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। [৬২]

অসিতঞ্জন

ঘট জাতকে [৬৩] অসিতঞ্জন উত্তর ভারতের এক প্রসিদ্ধ অঞ্চলে অবস্থিত। এটি উত্তরাপথের কংসভোগ দেশের রাজধানী। জানা যায় অসিতঞ্জনে রাজা মহাবংস রাজত্ব করতেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখ পাওয়া যায় বুদ্ধের সময়ে তপস্সু ও ভল্লুক নামের দু'জন বণিক এ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এরা দু'জনই ছিলেন বুদ্ধের প্রথম গৃহী উপাসক। প্রাচীন জাতক অনুসারে তৎকালে এটি প্রসিদ্ধ জনপদ হিসেবে এর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অস্সপুর

চেতিয় জাতকে অস্সপুর বা অশ্বপুরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। অস্সপুর ছিল চেতিরাজ্যের রাজধানী। এটির অবস্থান ছিল সোত্থিবতীর দক্ষিণে। চেতিয় জাতক হতে জানা যায় চেতি রাজার পিতার নাম ছিল উপচর। চেতি হঠাৎ একদিন রাজ্যের একস্থানে এক রাজকীয় শ্বেত অশ্ব লক্ষ্য করেন। রাজকুমার সেই সময় থেকে নগরটির নাম রাখেন অস্সপুর বা অশ্বপুর। সংস্কৃতে অশ্বপুর বলা হয়। তথাগত বুদ্ধের এটি একটি জনবহুল এবং ঘনবসতি নগরী ছিল। বুদ্ধ এ নগরীর নাগরিকদের সমস্ত বিষয়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তাই জাতক অনুসারে এটি প্রাচীনতম জনপদ হিসেবে সুপরিচিত ছিল। [৬৪]

উজ্জেনি

চিত্রসম্ভূত (জাতক নং-৪৯৮), জাতক অনুসারে এটি মধ্য ভারতের গোয়ালিয়রে অবস্থিত। প্রাচীন সময়ে উজ্জেনি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ নগরী। বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের রাজা ছিলেন চণ্ডপজ্জোত। এ প্রসিদ্ধ নগরে সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ এবং কন্যা সংঘমিত্রার জন্মস্থান। জাতক এবং প্রাচীন গ্রন্থ হতে অনুমান করা যায় এটি একটি প্রাচীনতম জনপদ।

উত্তর পঞ্চাল

চেতিয় জাতক থেকে জানা যায় এর অবস্থান উত্তর ভারতের থানেশ্বর অঞ্চলে। পূর্বে এটি কুরু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরো উল্লেখ আছে যে, চেতি রাজ উপচরের চতুর্থ পুত্র সেখানে মণিমুক্তা খচিত

Dhaka University Institutional Repository

রাজকীয় চক্রপঞ্জর দেখেছিলেন এবং সেখানেই নগর প্রতিষ্ঠিত করে তার নাম রেখেছিলেন উত্তর পঞ্চাল। জাতকে এ নগরটির উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। [৬৫]

উলুম্প

ভদ্দসাল জাতক [৬৬] হতে জানা যায় এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার পিপ্রাওয়ার পাশ্ববর্তী অঞ্চল। উলুম্প প্রাচীন শাক্যরাজ্যেরই এক প্রাচীন নগরী। এখানে "গন্ধকুটি" নামে এক প্রসিদ্ধ বিহার ছিল যেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিত ভগবান বুদ্ধের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। জাতক গ্রন্থ থেকে এ জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় বলে অনুমান করা যায় প্রাচীকালে এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[৬৭]

সোভিত

সোভিতের অবস্থান বর্তমান ভারতেই। জাতক থেকে জানা যায় সোভিত একটি প্রাচীন এবং পবিত্র নগরী। এখানে অতীত বুদ্ধ অতথদসসী জন্মলাভ করেছিলেন। পালিগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এর নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটি ভারতবর্ষের একটি পবিত্র জনপদ বলে অভিহিত।

হত্থিপুর

হত্থিপুর বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে মীরুত জেলায় অবস্থিত। এটি বর্তমানে মেরাত নামে পরিচিত। চেতিয় জাতক থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এটি চেতি রাজ্যের প্রসিদ্ধ নগরী। মহাসম্মত বংশের রাজা উপচরের জ্যেষ্ঠপুত্র এ নগরটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আরো জানা যায়, এ বংশের রাজারাই পর্যায়ক্রমে নগরটির শাসনভার পরিচালনা করেন। প্রাচীনগ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্যে এ নগরের নাম পাওয়া যায় এবং এটি ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। প্রাচীনকালে এ নগরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা যায়। [৬৮]

জাতকে প্রধান প্রধান গ্রাম ও দেশ সমীক্ষা

জাতকে প্রাচীন ভারতের বহু গ্রামের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে জাতক গ্রন্থ সমীক্ষাপূর্বক গ্রাম সমূহের নাম উপস্থাপন করা হলো:

১. কাশী গ্রাম (লৌহকুম্ভী জাতক, জাতক নং-৩১৪, মর্কট জাতক, জাতক নং-১৭৩, দ্রোহি মর্কট জাতক, জাতক নং-১৭৪, শতপত্র জাতক, জাতক নং-২৭৯, অভ্যন্তর জাতক, জাতক নং-

Dhaka University Institutional Repository

২৮১, বর্দ্ধকি শূকর জাতক, জাতক নং-২৮৩, মহাকপি জাতক, জাতক নং-৫১৬, পানীয় জাতক, জাতক নং-৪৫৯, দূত জাতক, জাতক নং-৪৭৮, তক্কল জাতক, জাতক নং-৪৪৬, আশঙ্কা জাতক, জাতক নং-৩৮০)।

২. প্রত্যন্ত গ্রাম (শশ জাতক, জাতক নং-৩১৬, মশক জাতক, জাতক নং-৪৪, খরস্বর জাতক, জাতক নং-৭৯, শকুন জাতক, জাতক নং-৩৬)।

৩. মচল গ্রাম (মহাধর্ম্মপাল জাতক, জাতক নং-৪৪৭)।

৪. চণ্ডাল গ্রাম (চিত্রসম্ভূত জাতক, জাতক নং-৪৯৮, আম্র জাতক, জাতক নং-৪৭৪)।

৫. গ্রাম (কাঞ্চন খণ্ড জাতক, জাতক নং-৫৬, কুহক জাতক, জাতক নং-৮৯, শ্যাম জাতক, জাতক নং-৫৪০, খুল্লবোধি জাতক, জাতক নং-৪৪৩,স্পন্দন জাতক, জাতক নং-৪৭৫, কুম্ভকার জাতক, জাতক নং-৪০৮, সমুদ্রবাণিজ জাতক, জাতক নং-৪৬৬)।

৬. নিগম (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জাতক, জাতক নং-৪৪৪, হারিত জাতক, জাতক নং-৪৩১, অস্থিসেন জাতক, জাতক নং-৪০৩, কুণ্ডককুক্ষি-সৈন্ধব জাতক, জাতক নং-২৫৪, খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১, ভীমসেন জাতক, জাতক নং-৮০)।

৭. ভোগ গ্রাম (রথলট্ঠি জাতক, জাতক নং-৩৩২, অর্থস্যদ্বার জাতক, জাতক নং-৮৪)।

৮. ব্রাহ্মণ গ্রাম (শীলিকেদার জাতক, জাতক নং-৪৮৫, সুবর্ণকর্কট জাতক, জাতক নং-৩৮৯, বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

৯. গণ্ড গ্রাম (বিসপুস্প জাতক, জাতক নং-৩৯২)।

১০. মাতুল গ্রাম (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

১১. কোটি গ্রাম (মহাপ্রণাদ জাতক, জাতক নং-২৬৪)।

১২. নিগম গ্রাম (কুণ্ডককুক্ষি জাতক, জাতক নং-২৫৪, খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১, ভীমসেন জাতক, জাতক নং-৮০)।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. পাটল গ্রাম (পদকুশলমাণব জাতক, জাতক নং-৪৩২)।

১৪. নালগ্রাম (শরভঙ্গ জাতক, জাতক নং-৫২২)।

১৫. লম্বচুড়ক গ্রাম (শরভঙ্গ জাতক, জাতক নং-৫২২, ইন্দ্রিয় জাতক, জাতক নং-৪২৩)।

১৬. নলকপান গ্রাম (নলপান জাতক, জাতক নং-২০)।

১৭. যবমধ্যক গ্রাম (মহাউম্মার্গ জাতক, জাতক নং-৫৪৬)।

১৮. শালিন্দী ব্রাহ্মণ গ্রাম (সুবর্ণকর্কট জাতক, জাতক নং-৩৮৯)।

প্রধান প্রধান জনপদের ঐতিহাসিক মূল্য

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল না। ভারতে কোন অখণ্ড সর্বভারতীয় রাষ্ট্রও ঐ যুগে ছিল না। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায়, ১৬ টি রাজ্য ষোড়শ মহাজনপদে তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভক্ত ছিল। পণ্ডিতদের মতে এ ১৬টি জনপদ ছিল বড় রাজ্য। বৌদ্ধ রচনাগুলোতে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর নাম নেই। পাণিনির সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ সময় উত্তর ভারতে আসলে ৩০টি জনপদ বা রাজ্য ছিল। এ ১৬টি মহাজনপদ বা রাজ্যের অধিকাংশ ছিল রাজতন্ত্রী সংবিধানে শাসিত। তবে এদের পাশাপাশি কয়েকটি প্রজাতন্ত্রী রাজ্য ছিল। এ রাজ্যগুলোর অবস্থান ও বিবরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা প্রচুর তথ্য দিয়েছেন। তাই জানা দরকার কিভাবে ভারতবর্ষ তার বিকেন্দ্রীভূত অবস্থা থেকে মগধের নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত শাসনে আসল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি দিক হলো বিকেন্দ্রীয়করণের সাথে কেন্দ্রীকরণের নিরন্তর সংঘাত। ষোড়শ মহাজনপদে মগধের অন্তর্ভুক্তকে কেন্দ্রীয়করণ শক্তির জয় বলা হয়। অঙ্গুত্তর নিকায় ও জাতকের আলোকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐ ১৬টি মহাজনপদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ ১. কাশী ২. কোশল ৩. অঙ্গ ৪. মগধ ৫. বৃজি বা বজ্জি ৬. মল্ল ৭. চেদী ৮. বৎস ৯. কুরু ১০. পাঞ্চাল ১১. মৎস্য ১২. সুরসেন ১৩. অস্মক ১৪. অবন্তী ১৫. গান্ধার ১৬. কম্বোজ। উপরোক্ত ১৬টি রাজ্য বা মহাজনপদ সম্পর্কে কাণিংহাম ও ডঃ রায় চৌধুরী রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভূগোলের চিত্র পাওয়া যায়। [৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতে অনেক গ্রাম, দেশ, নগর ও জনপদের নাম পাওয়া যায়। নগর সমীক্ষায় দেখা যায়, জাতকে ১৪৯ টির মতো নগর আছে। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় ও জাতক গ্রন্থে ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে দেখা যায়, প্রধান প্রধান জনপদ এবং নগরসমূহ উত্তর ভারতে অবস্থিত ছিল। এসব গ্রাম ও জনপদকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতের রাজনীতি আবর্তিত হতো এবং এসব গ্রাম, নগর ও জনপদে নানা শ্রেণি-পেশার লোক বসবাস করতো। অতএব বলা যায়, প্রাচীনকালের এ ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে রাষ্ট্র ও নগর কাঠামো বিকাশ লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশনা

১. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ করুণানন্দ ভিক্ষু; জুন ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮০।

২. ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া; ডিসেম্বর ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৫৯।

৩. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৮০।

৪. ইন্দ্রিয় জাতক (৪২৩), শশ জাতক (৩১৬), কুণাল জাতক (৫৩৬), পুতিমাংস (৪৩৭), বিশন্তর জাতক (৫৪৭), সমুদ্র জাতক (২৯৬)।

৫. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ. ১৬০-১৬১।

৬. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৮০-৮২।

৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৪।

৮. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (ষষ্ঠ মুদ্রণ), জাতক নং-৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৮৪-৮৫।

১০. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১১ বাংলা (চতুর্থ মুদ্রণ), জাতক নং-৪৯৯।

১১. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৫২৭

।

১২. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৮।

১৩. জাতক (৬ষ্ঠ খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (ষষ্ঠ মুদ্রণ), জাতক নং-৫৪৩।

১৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৩।

১৫. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-১০০।

১৬. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৪।

১৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৯।

১৮. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৯৬।

১৯. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৮।

২০. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৪০৮।

২১. জাতক (৬ষ্ঠ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৪২।

২২. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০০।

২৪. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৫৪।

২৫. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১০০।

২৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০০।

২৭. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৩১।

২৮. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির; মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ. ১।

২৯. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১০০।

৩০. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী ,কলকাতা, ১৪২৮ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-২১৩।

৩১. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৬৩।

৩২. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১০৬।

৩৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৭।

৩৪. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৫৪।

৩৫. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১০৭।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৮।

৩৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৩।

৪০. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৯।

৪১. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫২২।

৪২. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১১০।

৪৩. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৩৩।

৪৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১১০।

৪৫. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৩৭।

৪৬. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৫৮।

৪৭. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ১১৩-১১৪।

৪৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৮।

৪৯. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৪১৩।

৫০. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৯৫।

৫১. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৮৮।

৫২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯২।

৫৩. জাতক (৫ম খণ্ড)ঃ জাতক নং-৫৩৭।

৫৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. জাতক (৬ষ্ঠ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৪৬।

৫৬. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৩।

৫৭. জাতক (৬ষ্ঠ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৩৯।

৫৮. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৩।

৫৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৩।

৬০. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৮০।

৬১. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯৩।

৬২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৫।

৬৩. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৫৪।

৬৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৮৬-৮৭।

৬৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৯।

৬৬. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৬৫।

৬৭. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৯০।

৬৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫।

৬৯. ভারত ইতিহাস পরিক্রমাঃ অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি; শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪ বাংলা (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাতক সাহিত্যে নর-নারী ও জন জীবন

ভূমিকা

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধ সমকালীন এবং পরবর্তী কয়েক শতবর্ষ পরিব্যপ্ত ভারতীয় সমাজ জীবনে নর-নারীদের জন-জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং বিচার বিশ্লেষণে এ অধ্যায়ে ঐসব নর-নারীদের জন-জীবন এবং তাদের নানা পেশা-জীবিকা সম্পর্কে উপস্থাপন করা হলো। যেমন প্রথমে বিবাহ প্রথার কথা ধরা যাক।

বিবাহ প্রথা

এখানে সে সময়কার প্রচলিত বিবাহ প্রথাগুলোকে নানাভাবে বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে। প্রথমে চার প্রকার বিবাহ প্রথা পাই। যেমন-

(ক) স্বয়ম্বর বিবাহ।

(খ) গান্ধর্ব বিবাহ।

(গ) রাক্ষস বিবাহ।

(ঘ) বহু বিবাহ। [১]

এছাড়া প্রাচীন ভারতের বিবাহ সম্পর্কে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীনতম স্মৃতি শাস্ত্র অনুসরণ করেছেন এবং সেখান থেকে আট প্রকার বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিবাহগুলো নিম্নরূপঃ

১. ব্রাহ্ম বিবাহ

২. দৈব বিবাহ

৩. আর্য বিবাহ

৪. প্রাজাপত্য বিবাহ

৫. গান্ধর্ব বিবাহ

৬. আসুর বিবাহ

৭. রাক্ষস বিবাহ

৮. পৈশাচ বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয়দের বিবাহ সম্পর্কে মেগাস্থিনিস বলেছেন, ''বিবাহের সময় একজোড়া বলদ দান করা হতো।"[২] খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আর্য বিবাহের কথা জানা যায় এবং এ বিবাহ সম্পর্কে জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। আসুর বিবাহে দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ এবং দশরথের সঙ্গে কৈকেরীর বিবাহের কথা জানা যায়। মহাভারতে রাক্ষস বিবাহ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়। ভীষ্ম কাশীর রাজকন্যাদের তার সৎ ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য জোরপূর্বক নিয়ে গিয়েছিলেন। আসুর এবং রাক্ষস বিবাহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনেকটাই প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। আবার পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা উত্তর পশ্চিমের বিবাহকে হীন বা নিচ বলে মনে করতো । এ দুইটি বিবাহ পদ্ধতি অনার্য বলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য্য গুণে মুগ্ধ হয়ে নিষিদ্ধ সত্ত্বে আনুগত্য হয়ে যেত।

উপরোক্ত আট প্রকারের বিবাহের সর্ব প্রথম চার প্রকারের বিবাহকে ধর্মীয় বিবাহ বলে মনে করা হতো। কারণ বিবাহ সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করা হতো সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের কোন রকম সুযোগ এবং অধিকার ছিল না। এ বিবাহগুলোকে কোন চুক্তি মনে করা হতো না। ধর্মীয় সংস্কার মনে করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন আর এগুলো ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিবাহ সম্পর্কে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রথম চারটি বিবাহকে প্রশংসা এবং শেষের চারটি বিবাহকে নিন্দা করলেও মনু প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব এবং রাক্ষস বিবাহকে আইনী এবং পৈশাচ এবং আসুর বিবাহকে বেআইনী বলেছেন।[৩] তিনি বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিবাহ অনুমোদন করেছেন। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম চার প্রকারের বিবাহ ভিন্ন আসুর এবং গান্ধর্ব বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ অথবা গান্ধর্ব এবং রাক্ষস অথবা দু'য়ের মিশ্রণ, অথবা শুধুমাত্র রাক্ষস বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। বৈশ্য এবং শুদ্রদের ক্ষেত্রে তিনি আসুর, গান্ধর্ব এবং পৈশাচ অথবা শুধু আসুর বিবাহ অনুমোদন করেছেন। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয় শাস্ত্রকারেরা সম্মতি দেননি কিন্তু অসম্মতি সত্ত্বেও তখন পূর্বের মতোই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পারস্পারিক ইচ্ছায় অথবা ক্রয় বন্দিত্ব, এমনকি অপহরণের সাহায্যেও বিবাহ হতো।

উপরোক্ত আলোচনা সাপেক্ষে মনে হয় গান্ধর্ব বিবাহকে তখনকার সময়ে মোটামুটি সম্মান করা হতো। তবে এই বিবাহে ব্রাহ্মণদের সম্মতি ছিল কিনা সেটা বলা সম্ভব নয় কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং নিম্ন বর্ণের বা শ্রেণিদের জন্য এ বিবাহের স্বীকৃতি ছিল। আর্যরীতির বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক অথবা কন্যাগণের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে বিবাহ না হলেও অপ্রচলিত ছিল না। আবার রাক্ষস বিবাহের প্রচলনটা বিশেষকরে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেখা যেত। পৈশাচ বিবাহ শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের জন্য ছিল। নিম্নবর্ণের মধ্যে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। পৈশাচ বিবাহে সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না বা দেওয়া হতো না। পৈশাচ বিবাহ সবাই নিন্দার চোখে দেখত। [৪]

বিবাহ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধযুগেও বিবাহ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে তিন ধরণের বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। (১) কন্যা ও পাত্র উভয়পক্ষের অভিভাবকের মতামতের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত বিবাহ, (২) স্বয়ম্বর বিবাহ এবং (৩) গান্ধর্ব বিবাহ। এই তিন ধরনের বিবাহ আমরা বৌদ্ধযুগ থেকে পাই। বৌদ্ধযুগে মেয়েদের বিবাহের বয়স ষোল থেকে বিশ বছরের মধ্যেই কার্যকর করা হতো। ভদ্রাকুণ্ডলকেশী, ইসিদাসী, পটাচারা মল্লিকাদেবী প্রমুখ মহিলাদের ষোল-বছর বয়সেই বিবাহ হয়েছিল। তখনকার সময়ে ষোল বছর বয়সকে সাবালিকা বলে গণ্য করা হয়েছে, তাহলে এটি বাল্য বিবাহ নয়।[৫] উপরোক্ত প্রাচীন ভারতের বিবাহ এবং বৌদ্ধ যুগের বিবাহ সম্পর্কে জানা হলো। নিম্নে জাতক সাহিত্যের বিবাহ সম্পর্কে প্রদত্ত হলোঃ

জাতক সাহিত্যের আলোকে বিবাহের যে রীতি দেখা যায় তা হলো দুই পরিবারে দুই কর্তা তাদের যৌবনকালে পরস্পরের নিকট একই মতামত পোষণ করে, উভয়ের মধ্যে একজনের কন্যা ও একজনের পুত্র হলে তারা পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। জাতকের আরো এক জায়গা থেকে জানা যায় কন্যার অভিভাবকের অর্থাৎ কন্যার গৃহে বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হতো। প্রাচীন ভারতে জাতক সাহিত্যে বরপণ নেওয়ার কথা উল্লেখ পাওয়া না গেলেও কন্যাপণ নেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কন্যাপণ নেওয়াটা বুদ্ধ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিল।

(ক) স্বয়ম্বর বিবাহ

এই বিবাহ সম্পর্কে কুণাল জাতকে (জাতক নং-৫৩৬) রাজকুমারী কৃষ্ণ তাঁর স্বয়ম্বর সভায় আহূত পাণি প্রার্থীদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে উক্ত পাঁচজনকে পতিরূপে লাভ করেন। কুলায়ক জাতক (জাতক নং-৩১) কাহিনীতে উল্লেখিত অসুররাজ বেপচিত্তিয় তাঁর কন্যা সুজাতার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এক স্বয়ম্বর সভা আহবান করেন এবং সুজাতার সেই সভাস্থ ব্যক্তি বর্গের মধ্যে একজনকে পতিরূপে নির্বাচন করে তার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন। কিন্তু জাতক গ্রন্থে আরো উল্লেখ পাওয়া যায় স্বয়ম্বর সভায় কন্যা পছন্দের পাত্র বেছে নিতে পারলেও কোন

Dhaka University Institutional Repository

কারণে কন্যার পিতার যদি অপছন্দ হতো সেক্ষেত্রে কন্যার পছন্দের পাত্রের সাথে বিবাহ না দিয়ে নিজের পছন্দমতো কোনো পাত্রের হাতে কন্যার মতামতের উপর ভিত্তি না করে কন্যাদান করতে পারতেন।

(খ) রাক্ষস বিবাহ

এ বিবাহ ক্ষেত্রে জাতকে উল্লেখ আছে কোশলরাজ বারাণসী রাজা কে হত্যা করে তাঁর রাজ্য অধিকার করে এবং বারণসীরাজের অগ্রমহিষীকে স্বীয় প্রধান মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। স্বামীহত্যা পূর্বক স্ত্রীকে বিবাহ করার রীতিই হলো রাক্ষস বিবাহ।

(গ) বহু বিবাহ

এক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ হয় অর্থাৎ একই নারীর একই সঙ্গে একাধিক পতি গ্রহণ বা নারীর বহু বিবাহের দৃষ্টান্তও জাতক সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীরা সহমৃতা হতেন কিনা সে বিষয়ে জাতকে কোনো উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, বিধবা বিবাহ যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল তার আভাস পাওয়া যায়, যেমন পালি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ নকুলমাতার কাহিনী এবং উৎসঙ্গ জাতকে (জাতক নং-৬৭) বর্ণিত জনৈক রমনীর কাহিনী। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত ছিল অশাতরূপ জাতক (জাতক নং-১০০) থেকেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভূরিদত্ত জাতক (জাতক নং-৫৪৩) কাহিনীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র এক বিধবা নাগ রমণীকে বিবাহ করেছেন। [৬]

(ঘ) সবর্ণে বিবাহ

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় সবর্ণে বিবাহের প্রচলন ছিল। এছাড়া এক বর্ণের সাথে যে আরেক বর্ণের সম্পর্ক হতো না এমন নয়। বিভিন্ন জাতকে সবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমজাতিকুল থেকে পাত্রী গ্রহণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। শৃগাল জাতকে [৭] উল্লেখ আছে বারাণসীরাজের রাজত্বকালে তরুণ সিংহকুমারিকে দেখে প্রেমে পড়ে শৃগাল তাকে মিষ্ট আলাপ করতে করতে বলতে শুরু করলেন, 'ওহে সিংহকন্যা আমিও চতুষ্পদ, তুমিও চতুষ্পদ, এস তুমি আমার পত্নী হও, আমি তোমার পতি হতে চাই, তাহলে আমরা অতি সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারব। অর্থাৎ সিংহ এবং শৃগাল একই বর্ণ। উরগ জাতকে[৮] বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি কৃষিকাজ করে জীবন-জীবিকা অর্থাৎ তাঁর সংসার পরিচালনা

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। বোধিসত্ত্বের এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। পুত্রটিকে বিবাহের উপযুক্ত সময়কালে তাঁর কুলের কুমারীর সাথে বিবাহ দিলেন।

সুবর্ণমৃগ জাতকে [৯] উল্লেখ আছে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৌন্দর্য্য সম্পন্ন, দেহ ছিল হেমবর্ণ, চোখ দুটি ছিল মণিগোলকোপম এবং মুখখানি ছিল রক্তকম্বল পিণ্ডের মতো উজ্জ্বল। তাঁর স্ত্রী ছিল অতি শ্রীসম্পন্ন এবং তাঁরা সুখে শান্তিতে একসাথে বসবাস করছিলেন। শুধু তাই নয় এই মৃগী নিজের ক্ষমতাবলে ব্যাধ অসি ও শক্তির কাছে স্বামীকে মুক্ত করলেন। মৃগী ব্যাধের আগমন পথে গিয়ে প্রণিপাতপূর্বক বললেন, প্রভু! আমার স্বামী সুবর্ণমৃগ শীলাচারসম্পন্ন এবং অশীতি সহস্র মৃগের অধিপতি । এই তাঁর স্বামীকে মৃত্যুর পথ থেকে রক্ষা করলেন। স্বামীকে সুখী দেখে মৃগী আনন্দিত হলেন এবং ব্যাধকে ধন্যবাদ দেবার ছলে একটি গাথা বললেন-

মৃগরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ মোর
উপজিল মনে আজ, সেইরূপ যেন
জ্ঞাতিমিত্রগণ সহ আনন্দ অপার
ভব ভাগ্যে, ব্যাধরাজ, হয় চিরকাল। [১০]

প্রাচীন ভারতবর্ষে সমজাতিকুল এবং সবর্ণ ছাড়া যে অন্য বর্ণে বিবাহ একেবারেই হতো না এমন নয়। অর্থাৎ অসবর্ণতেও বিবাহ হতো। উল্লেখিত উদ্দালক জাতক (জাতক নং-৪৮৭) থেকে জানা যায় বারাণসীরাজের সময় বোধিসত্ত্ব ছিলেন পুরোহিত। তিনি হঠাৎ একদিন রূপবতী গণিকাকে দেখে তাকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর ঔরষে এক পুত্র জন্মলাভ করলো এবং তাঁর নাম হলো উদ্দালক। কুল্মাষপিণ্ড জাতকে [১১] জানা যায় বোধিসত্ত্ব রাজা হয়েও রূপে আসক্ত হয়ে কোশলরাজের পরম সুন্দরী মালাকার কন্যা মল্লিকার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে সমস্ত রাজধানী অলংকৃত করা হয়েছিল, আবার নগরবাসীরা বিভিন্ন উপহার সামগ্রী হাতে নিয়ে উপস্থিত হলো এবং ষোড়শ সহস্র নর্তকী নৃত্য পরিবেশন করেছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও বোধিসত্ত্ব তাঁর পূর্বজন্মের কথা ভুলে যায় নি বার বার তাঁর মনে নাড়া দিচ্ছিল। তিনি ভাবছিলেন আজকের সবকিছু হয়েছে আমি যে চারজন প্রত্যেক বুদ্ধকে চারটি কুল্মাষপিণ্ড দিয়েছিলাম এসব তারই ফলাফল। তাদেরই জন্যই আজ আমি সব কিছুতেই সুফল পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

কাষ্ঠহারি জাতকে [১২] বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ফল পুষ্পাদি আহরণের জন্য উদ্যানে গেলেন এবং কাঠসংগ্রহ করা এক রমনীকে দেখতে পেলেন। তাকে দেখে রূপে আসক্ত হয়ে গান্ধর্ববিধান মতে বিবাহ করলেন। বিবাহের কিছুদিন পর রাজার ঔরষে বোধিসত্ত্ব রমনীর গর্ভে প্রবেশ করলো। রাজা একথা জানার পর রাজা তার রমনীর হাতে স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী দিলেন যদি কন্যা হয় তাহলে এটা বিক্রয় করে তার ভরণ-পোষণ করবে অন্যদিকে যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে অঙ্গুরি নিয়ে আমার কাছে যাবে। যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলো এবং সেই অঙ্গুরী নিয়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর বাবার কাছে চলে গেল। এছাড়া হিউয়েন সাঙ এবং বাৎসায়ন সবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছেন। হিউয়েন সাঙ-এর মতামতে পারস্পারিক নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ সম্ভব নয়। [১৩]

বাহ্য ও সুজাত জাতকে বারাণসীর রাজারা কামখেয়ালির বশবর্তী হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বাহ্য জাতক [১৪] থেকে জানা যায় স্থূলাঙ্গী রমনী রাজপ্রাঙ্গনে মলত্যাগ করার সময় যেভাবে লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্বক যে নিজের পরিচ্ছদে প্রতিচ্ছন্ন হয়ে পলকের মধ্যে বেগপীড়া থেকে অব্যাহতি পেতে পারে সে নিশ্চয় পুণ্যবান নারী। তাই রাজা সেই পুণ্যবান রমনীকে নিজের অগ্রমহিষী পদে অধিষ্ঠিত করলেন। আবার সুজাতা জাতকেও [১৫] সুজাতা ছিল পর্ণিক কন্যা। সুজাতা একদিন টুকরি ফুল মাথায় নিয়ে ফুল কিনবে বলে রাজ প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিল হঠাৎ করে রাজা সুন্দরী সুজাতার কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করে নিলেন। এছাড়া জাতক সাহিত্য থেকে আরো জানা যায় যে শাক্যবংশীয় রাজা মহানামার ঔরসে নাগমুণ্ডা নাম্মী দাসীর গর্ভে বাসব ক্ষত্রিয়ার জন্ম হয়েছিল এবং রাজা প্রসেনজিৎ ঐ কন্যাকে শাক্যকুলজাত মনে করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। বিবাহ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় জানা যায় প্রাচীনকালে অর্থ্যাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্য থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় সে সময়ে সবর্ণে বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তা নয় অন্য বর্ণের সাথেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। [১৬]

রাজকূলে বহুবিবাহ

প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্যে রাজাদের সম্পর্কে একাধিক বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি রাজাদের ষোড়শসহস্র পত্নীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখিত কুশ জাতকে [১৭] মল্লরাজ্যের রাজধানী কুশাবতী নগরের রাজা ইক্ষবাকুর ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিল এবং শীলবতী নাম্নী রমণী অগ্রমহিষীর পদ লাভ করেছিল। শীলবতী ছিল শীলসম্পন্না এজন্য তাঁর গর্ভে পুত্র হয়েছিল এবং তাঁর নাম রাখা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল কুশকুমার। এছাড়া [১৮] দশরথ এবং মহাপদ্ম [১৯] জাতকেও ষোড়শ সহস্র পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুবিবাহের প্রথা ছিল সেটা আমরা উল্লেখিত জাতক থেকে প্রমাণ পাই। এছাড়া বহুবিবাহের প্রথা যে শুধুমাত্র রাজকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। সেকালে অর্থাৎ প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ নিম্ন শ্রেণির এবং ধনী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একাধিক বিবাহের খোঁজ পাওয়া যেত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণির মানুষের একটি স্ত্রী থাকত তারা বহু বিবাহে অংশ গ্রহণ করতো না। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে বহুবিবাহের প্রচলনটা একেবারেই ছিল না। প্রথম স্ত্রীর চরিত্র এবং সৎ স্বভাবের হলে এবং পুত্র সন্তান থাকলে স্বামীদের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল এছাড়া নারদ স্মৃতিতেও বহু বিবাহের বিপক্ষে ছিল। অর্থাৎ বহু বিবাহ ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নয়। একাধিক বিবাহের পর যারা সংসারের দায়ভার গ্রহণ করতে পারত তারাই একাধিক বিবাহ করতো ।

মহাভারতে স্বামী পুনরায় বিবাহ করাকে, তার দুঃখকে নানাভাবে বর্ণনা করেছে। সেক্ষেত্রে বহু বিবাহ আবার সবর্দা দুঃখের হবে এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর পুত্র সন্তান থাকে না তাহলে স্বামীর পক্ষে অন্য স্ত্রী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটা স্বামীর ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী তার সন্তানাদিসহ, প্রধান মর্যাদা ভোগ করতেন এবং পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে তার স্থান ছিল স্বামীর পাশে। তাই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও একাধিক বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। [২০] এছাড়াও বৌদ্ধযুগেও বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন, উজ্জয়িনীর কন্যা ইসিদাসী। সে ছিল উজ্জয়িনীর ধনকুবের একমাত্র কন্যা। সাকেত নগরীর উচ্চকূলের বণিকের সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ইসিদাসী শ্বশুর বাড়ীর সবাইকে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেও অনাদার ও অবহেলায় স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল। এভাবে ইসিদাসীকে তিনবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। এছাড়াও উব্বিরী, সোনা, সকুলা এরা সকলেই রাজা প্রসেনজিতের পত্নী ছিলেন। একইভাবে ক্ষেমা, বৈদেহী এরাও মগধরাজ বিম্বিসারের পত্নী ছিলেন। [২১]

নারীদের সিংহাসন লাভ

সিংহাসন লাভ বা রাজ্য শাসন যে শুধুমাত্র পুরুষেরাই পরিচালনা করতেন এমন নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্য থেকে নারীরা রাজ্য শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার উল্লেখও পাওয়া যায়। উল্লেখিত উদয় জাতকে [২২] কাশীরাজ্যের সরুন্ধন নগরের কাশীরাজ্যের পুত্র উদয়ভদ্রের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

তার বৈমাত্রেয় ভগিনী উদয় ভদ্রার বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহের পর কাশীরাজ তাঁকে সিংহাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এছাড়া সীতাকেও রাম তাঁর সিংহাসনের দায়িত্বভার দিতে প্রস্তুত ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। [২৩] শুধু জাতক সাহিত্যে নয়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও রাজ্যশাসনে নারীদের বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, পাণ্ড্য জাতি তখন নারীদের শাসনাধীন ছিল। বিভিন্ন উল্লেখ থেকে মনে হয় প্রাচীন ভারতবর্ষের নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং স্বাধীনভাবে বাস করতো।[২৪]

নর-নারীদের প্রব্রজ্যা

প্রাচীন ভারতের নর-নারীরা যে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট সেটা জাতক সাহিত্য থেকে জানা যায়। কারণ ধর্মের জন্য তখন মানুষ সর্বস্বত্যাগ, এমনকি বিপুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্পদ এমনকি সংসার, পুত্র-কন্যা, স্ত্রীকে পরিহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। কোন বাধ্যকতা ছিল না। ধর্মের জন্য আকুল হয়ে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতো । বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং সংসারের মধ্যে থেকে ধর্মের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার এজন্য শাস্ত্রকারেরা দ্বিজাতিয় বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্য শেষ জীবনটা বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমের জন্য নির্দেশ করেছেন। জাতক পাঠে আরো জানা যায়, চতুরাশ্রমাবলম্বন প্রথা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য ধরাবাধা ছিল না ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অনেক বেশী প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে অনেকে গৃহে থেকে লেখা-পড়া করে বেদ, বেদাঙ্গ ষোল বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়ন করে গৃহত্যাগ করে বনে গমন করতেন। বনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করে কেউ একাকী আবার কখনও এক সাথে থেকে তপস্যানিরত হয়ে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করতেন। যাঁরা ঋষি সমাজের প্রধান ছিলেন তাঁর কুলপতি বা গণশাস্তা বলে পরিচিতি লাভ করতো । এসব ঋষিরা বেশী ভাগ সময়ই বনের বন্য ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। নারীরাও সংসারে মায়াজাল ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। নারীরাও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুত্র সন্তান-স্বামীকে ত্যাগ করতেও কোন দ্বিধাবোধ করতো না। [২৫]

উল্লেখিত অননুশোচনীয় জাতকে [২৬] সম্মিতভাষিণী এবং তার স্বামী দুইজনই প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা জানা য়ায়। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন এবং তক্ষশিলা নগরে শিক্ষা লাভ সমাপ্তি করে পিতা-মাতার কাছে ফিরে গেলেন। বোধিসত্ত্বের গৃহধর্মের কোন ইচ্ছা ছিল না। তারপরও পিতা-মাতার অনুরোধে কাশীরাজ্যের নিগম গ্রামের পরম সুন্দর নয়নান্দদায়িনী, অপ্সরাসৃদশী, সবর্বসুলক্ষণসম্পন্না কুমারী সম্মিতভাষিণীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হলো। কিন্তু বিবাহের পর দু'ইজন

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষু ব্রহ্মচারী যেমন নির্দ্দোষ ভাবে বসবাস করে, তারাও সেভাবে একত্রে বাস করছিল। কিছুদিন পর মাতাপিতার মৃত্যুর পর সমস্ত ধন-দৌলত দান করে হিমবন্ত প্রদেশ চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দু'জন ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং বন্য ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

কুম্ভকার জাতকে [২৭] উল্লেখ পাওয়া যায় বোধিসত্ত্ব এবং তাঁর পত্নী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হঠাৎ একদিন চারজন প্রত্যেকবুদ্ধ বোধিসত্ত্বের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। বোধিসত্ত্ব তাদেরকে দেখে খুবই আনন্দ এবং প্রীতি লাভ করে সুরসাল খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেশন করলো। খাওয়া শেষে প্রত্যেকবুদ্ধ চতুষ্টয় একেক জন করে একেকটি গাথা বলতে লাগলেন। তাদের ধর্মদেশনা শুনে বোধিসত্ত্ব এবং তাঁর পত্নী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। খুল্লবোধি জাতকে [২৮] বোধিসত্ত্বের নাম ছিল বোধিকুমার। বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করে পিতা-মাতার অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করলেন। বিবাহের পর অনুরাগভরে কখনও দু'জন দু'জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁরা এমনই পরিশুদ্ধ ছিলেন যে মিথুনধর্ম কাকে বলতো তারা জানতো না। কিছুদিন পর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের সম্পদ দান করে স্ত্রী পুরুষ দু'জনেই প্রব্রজ্যা নিলেন। প্রব্রজিত হওয়ার পর বনের মধুর ফল খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। শোণনন্দ জাতকে [২৯] বারাণসীর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী পুত্রদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ দেখে নিজেরাই প্রব্রজিত হলেন। উল্লেখিত জাতকে শোণকুমার এবং নন্দকুমার দুজনেই সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বিদ্যা শেষে পিতা-মাতা তাঁদেরকে সংসারমুখী হওয়ার কথা বললেন। কিন্তু তাতে সম্মত না হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প করলো এবং পিতা-মাতার বিপুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত সম্পদ দান করে সবাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। প্রব্রজিত হওয়ার পর পুত্রদ্বয় পিতা-মাতার সেবা ও বন থেকে মধুর মধুর ফল ভোজন ও নানা প্রকারের কাজকর্ম করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

এছাড়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নারীরা ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করতেন এবং ধর্মের প্রতি তাঁদের বেশ অনুরাগ ছিল। নারীরা সন্ন্যাসী হয়ে গানের সংকলন, সংকৃত কাব্য এবং নাটকও রচনা করেছিলেন। নাটক কাব্য রচনা করেই নারীরা থেমে ছিলেন না। তামিল ভাষায় জনৈক মহিলা কবি একজন প্রাচীন চোল রাজার যুদ্ধ জয়কে অবলম্বন করে একটি গাথা রচনা করেছিলেন। এমন অনেক নারী ছিল যাঁরা লিখতে, পড়তে এবং সংগীত রচনা এবং চিত্রশিল্প, মালা তৈরীর কাজে তাঁদের যে অগ্রগতি ছিল তাদের সন্ধান তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। [৩০]

Dhaka University Institutional Repository

আবার থেরী গাথায় বেশীর ভাগ ভিক্ষুণী যারা প্রব্রজিত হয়েছেন তারা সংসারের নানা অসুবিধা, অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন। এদের মধ্যে স্বামী-পরিত্যক্তা, বাল্যবিধবা, পুত্র কন্যাহারা ভিক্ষুণীরাও রয়েছেন এবং এদের মধ্যে প্রব্রজিত অনেকে জীবন যাপন করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পটাচারা, কৃশাগৌতমী, আম্রপালী, ভদ্রাকণ্ডলকেশী, ইসিদাসী, অড্ঢকাশী, বিমলা প্রমুখ। স্ত্রীলোকেরা উচ্চতর শ্রামণ্যফল এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। যেমন ধ্যানমার্গ, মার্গফল, বিবিধ বিদ্যা, অভিজ্ঞা, নিবার্ণ প্রত্যক্ষকরণে ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের কোন তারতম্য ছিল না। মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, ধর্মাদিন্না, ভদ্রকপিলানীর এরা সবাই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ ফল লাভে সক্ষম হয়েছিল। ভিক্ষুণীসংঘের নেতৃত্ব দানকারী ছিলেন শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের স্ত্রী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। নৃপতি বিম্বিসারের পত্নী পরমাসুন্দরী অন্তরর্দৃষ্টিলাভে সর্ব প্রধানরূপে স্বীকৃত হন। শ্রেষ্ঠ কন্যা উৎপলবর্ণা সাধনাবলে অর্হত্বফল লাভ করেন এবং বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধিপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত হন। অনোপমা ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশের সাত দিনের মধ্যে অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এছাড়া অনেকে যারা গৃহী জীবন-যাপনে অবহেলিত, অসম্মানিত, অনাকাংখিত ছিলেন, পুত্র কন্যা হারা, সংসার ত্যাগী ছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তারা দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি এবং সম্মান পায়। [৩১] এ প্রঁসঙ্গে ড. সুনন্দা বড়ুয়ার অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "জাতকে নরনারীদের বিচিত্র জীবন কথা, তাদের দৈনন্দিন জীবন-চর্যা গল্প আকার ধারণ করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের মুকুর চিত্র এই বিভিন্ন স্বাদের জাতক কাহিনী। কাত্যায়নী জাতকে (জাতক নং-৪১৭) দেখা যায় পুত্রবধূর প্ররোচনায় পুত্র মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধার জীবনের শোচনীয় দুর্গতিতে শক্র দুঃখিত চিত্তে তাকে উপদেশ দিয়ে চলে যান। অপ্রমত্ত কাত্যায়নীর শীল প্রভাবে পুত্র ও পুত্রবধূর বিরূপভাব চলে যায়। পরে উভয়ে বৃদ্ধার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। বৃদ্ধার ক্ষমা প্রদান ও নিজ পৌত্রকে কোলে নেওয়ার মধ্যে যে পরস্পর সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা সমাজ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গল্পে বিধৃত এই পরিচয় আবহমানকালের জীবন ধারার পরিচয়।[৩২]

নারীদের একাধিক পতিগ্রহণ

একাধিক বিবাহ প্রথাটি বেশীর ভাগই পুরুষের মধ্যে লক্ষ্যণীয় ছিল। কিন্তু একটা সময় নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে অথর্ববেদ থেকে জানা যায়, যে নারীর পূর্বে একজন পতি ছিল সে যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন পঞ্চৌদন অজ দান করলে তার কোন ক্ষতি হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোনো নারীর দশটি পতি থাকলেও সে তখন ব্রাহ্মণের পত্নী হয় তখন সেই ব্রাহ্মণই তার রাজন্য বা বৈশ্য পতিরা পতি নয়। অর্থাৎ এখানকার মুখ্য উদ্দেশ্যটা হলো ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্ম্যটা ঘোষণা করা এবং সাথে সাথে অন্য বর্ণের হীনত্ব প্রকাশ করা। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একটি নারীর দশটি স্বামী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবে নারীদের বহুপতিত্বের স্বীকৃতি বা অধিকার বেশী দিন ছিল না, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নিয়মটি বন্ধ হয়ে যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা ব্রাহ্মণে "যজ্ঞে একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে দু'টি বস্ত্রখণ্ড, তাই পুরুষ দু'টি স্ত্রী গ্রহণে অধিকারী, একটি বস্ত্রখণ্ডকে দু'টি খণ্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীরা দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ"। [৩৩] তাছাড়া জাতক সাহিত্যেও এক নারীর একাধিক পতিগ্রহণের কথা জানা যায়। উল্লেখিত কুণাল জাতকেও [৩৪] দত্তের পত্নী পিঙ্গিয়ানী একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক ছিল এজন্য ব্রহ্মদত্ত ঐ নারীকে অগ্রমহিষীর স্থান থেকে অপসারণ করে অন্য নারীকে সেই পদে আসীন করেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া এ জাতকে পঞ্চপাপা নাম্মী যে নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। সে নারী দু'ই রাজার অগ্রমহিষী ছিলেন। পঞ্চপাপার প্রথম স্বামীর নাম বক এবং দ্বিতীয় স্বামী ছিল প্রাবায়িক। দু'জনই রাজা পঞ্চপাপার প্রতি এতটাই মনোনিবেশ করেছিলেন যে, উভয় রাজাই নদীর দু'পারে দু'টা নগর স্থাপন করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। তিনি এক রাজার গৃহে এক সপ্তাহ থাকার পর অন্য রাজার গৃহে আর এক সপ্তাহ থাকতেন। নৌকা করে এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে আসা-যাওয়া করতেন। এখান থেকে পঞ্চপাপা সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, তিনি বৃদ্ধ খঞ্জ চালকের তার সাথেও ব্যভিচার করতেন।

শিল্প ও শিক্ষা

জাতক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কোন বর্ণনা পাওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। এজন্য বেশির ভাগ বিভিন্ন সাহিত্য এবং মতামতের উপর নির্ভর করতে হয়। ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ধর্মসূত্র, আর্যশাস্ত্র, মনু, স্মৃতিশাস্ত্র এবং উপনিষদ প্রভৃতি। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি, জাতক এবং মিলিন্দ প্রশ্ন প্রভৃতি। উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রাচীন সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য পাওয়া যায়। ধর্ম সূত্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে আরো বলা হচ্ছে যে, এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন এবং ব্যক্তিত্বের উন্মেষ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কৌটিল্য বেদ অধ্যয়ন পদ্ধতিগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। (১) শুশ্রূষা (অর্থাৎ গুরুর মুখ-নিঃসৃত শব্দগুলো শোনার আগ্রহ, (২) শ্রবণ সেগুলো কান দিয়ে শোনা), (৩) গ্রহণ (সেগুলো হৃদয়ঙ্গম করা), (৪) ধারণ (সেগুলোকে রক্ষা করা), (৫) ঊহা পোহ (সেগুলো আলোচনা করা), (৬) বিজ্ঞান (সেগুলোর অর্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা) এবং (৭) তত্ত্বাভিনিবেশ (সেগুলোর অন্তর্লীর্ন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা)। উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুগৃহ কিংবা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ছাত্র এক-চতুর্থাংশ তার আচার্যের কাছে শেখে, এক-চতুর্থাংশ শেখে সতীর্থদের কাছে, আর অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ শেখে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সে সময়ে ব্রাহ্মী লিপি এবং খরোষ্ঠী লিপির প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ লিখন পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল কিন্তু এ বিষয়ে মেগাস্থিনিস দ্বিমত পোষণ করেছেন। মেগাস্থিনিসের মতে, "ভারতীয়বাসীরা সে সময়ে লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল"। কিন্তু ষ্ট্রাবো তাঁর বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করেননি। কারণ স্ট্রাবো প্রমাণস্বরূপ সিন্ধু উপত্যকায় শিলমোহরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেটি বাদ দিলেও বৌদ্ধ যুগে ভারতীয়দের মধ্যে কিছু লিপিজ্ঞান ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে একটি বৌদ্ধ গ্রন্থে। সে গ্রন্থে খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে সন্ন্যাসীদের জন্য নিষিদ্ধ কিছু তালিকা পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ তালিকার মধ্যে কয়েকটি খেলার উল্লেখ ছিল এবং সেখানে "আক্ষরিক" কে বালকদের খেলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে অক্ষর জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব ছিল না বলা যায়। একই সাথে বিনয় পিটকও একই মতামত সমর্থন করে।

অন্যদিকে ভিক্ষুণীদেরকে পার্থিব শিলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে কিন্তু লিপিজ্ঞানকে নিষেধাজ্ঞা করা হয় নি। আরো বলা হচ্ছে যে, সেখানে পুত্রের বৃত্তি নির্বাচন সম্পর্কে তার পিতা-মাতা বলছেন তাঁদের সন্তান যদি লেখার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাতে তাদের কোন অসুবিধা নেই বরং সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কিন্তু তার আঙ্গুলে ব্যাথা হবে। এখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৌদ্ধ সংঘের কোন সদস্য কোন কারণে লিখিতভাবে কাউকে আত্মহত্যার উপদেশ দেয়, প্রতিটি অক্ষরের জন্য সে অন্যায় এবং উপযুক্ত সাজা ভোগ করবে। এছাড়া মনু অনেক রকম লিখিত দলিলের কথা বলেছেন। আবার কৌটিল্য পত্র, শাসন-দলিল এবং লেখার ত্রুটি, বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং নথিপত্র

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণকারী জন্য আলাদা দপ্তরের কথা বলেছেন। সেখানে রাষ্ট্রের রাজকীয় দানপত্র এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তির নকল রাখা হতো। স্ট্রাবো নিয়ারকাসকে উদ্ধার করে বস্ত্র খণ্ডের উপর লেখার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সম্রাট অশোকের বিভিন্ন লেখা থেকে ভারতীয়দের লিপিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্র থেকে শিক্ষা সম্পর্কে কিছু পাঠ করলে মনে হয় সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর বালকেরাই শিক্ষা লাভ করতো । [৩৫] এছাড়া অন্য গ্রন্থেও উচ্চ শ্রেণির লোকেরা অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিরা তারা নিজ গৃহে শিক্ষক নিযুক্ত করে তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাদান করতেন এবং শিক্ষকদের বেতন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন।

জাতক সাহিত্যে গুরুকে "আচরিয়" এবং শিষ্যকে অন্তেবাসীক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বাস করতেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এবং বাইরের দেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী এসে ভিড় জমাতেন। দেশের রাজা, মহারাজা, ধনবান, শ্রেষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা আচার্যকে নানাভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। গুরুর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে পনেরো বৎসর বয়সে শিক্ষা লাভ শুরু হতো। [৩৬] উল্লেখিত সংস্তব জাতক [৩৭] থেকে জানা যায় পনেরো বছর পর্যন্ত মায়ের নিকট শিক্ষা লাভ করার পর ষোল বছর বয়সে পর্দাপণ করলে অনেকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বাইরে যেতেন। এভাবে গুরু ছাত্রের শিক্ষা শুরু হয়। উল্লেখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় জাতকে দুই শ্রেণির শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়। এক উপাধ্যায় এবং অন্য জন আচার্য। মনুস্মৃতিতে আচার্যের স্থান উপরে। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে এর বিপরীত। সেখানে উপাধ্যায়কে উপরে স্থান দিয়েছে। উপাধ্যায় হতে গেলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দশ বছরের অভিজ্ঞতা দরকার হয়। কিন্তু আচার্যের জন্য ছয় বছরের অভিজ্ঞতাই চলে। সেক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব উপাধ্যায়ের উপর নিযুক্ত থাকতো এবং আচার্যের দায়-দায়িত্ব ছিল ছাত্রের দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপর। [৩৮]

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধ্যাপকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। শুধু তাই নয় তাদের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে জাতকে বহু আলোচনা পাওয়া যায়। একজন অধ্যাপকের বহু পাণ্ডিত্য এবং নানা প্রকারের শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হতে হতো। তাঁরা শাস্ত্র ও বিদ্যা চর্চায় খুবই দক্ষ ছিলেন। এখানেই শেষ নয় শিক্ষাদানেও তাদের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতক থেকে জানা যায়, ধনী কিংবা উচ্চশ্রেণির পরিবারের সন্তানেরা গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতো । উল্লেখিত

Dhaka University Institutional Repository

লোশক জাতকে [৩৯] বারাণসীবাসীগণ দরিদ্র বালকদের ভরণ-পোষণ ও সমস্ত শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া সুসীম জাতকে [৪০] এবং তিলমুষ্টি জাতকে [৪১] উল্লেখ আছে রাজা কিংবা ধনী পুত্ররা গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদ্যা লাভ করতেন এবং আচার্যরা তাদেরকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমতুল্য মনে করতেন। গরীব বালক কিংবা ধর্ম্মান্তেবাসীরা দিবাভাগে আচার্যদের সাংসারিক কার্য শেষ করে রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করতো । এভাবে তারা শিক্ষা লাভ করতো । জাতক গ্রন্থ কিংবা অন্যান্য গ্রন্থে ধনী পরিবারের সন্তানেরা গুরুকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদ্যা অর্জন করার কথা জানা গেলেও প্রাচীন গ্রন্থ কিন্তু মেধার কথা উল্লেখ করেছে অর্থাৎ একজন ছাত্র যখন গুরু গৃহে আসবে শিক্ষার জন্য তখন তাকে তার মেধার উপর ভিত্তি করে আসতে হবে। লেখা-পড়ায় অমনোযোগী ছাত্রদেরকে সেখানে কোন স্থান দেওয়া হতো না অর্থাৎ তাদেরকে গুরুগৃহ ত্যাগ করতে হতো। এমন সব ছাত্রদেরকে "খট্টারূঢ়" বলে আখ্যায়িত করা হতো। এসব ছাত্রদেরকে সমাজে সবাই নিন্দার চোখে দেখতো। [৪২]

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি, প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষকদের গুরুদক্ষিণা বা অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করতেন। সেসব শিক্ষককে নিম্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। মনু তাদেরকে নিন্দাসূচক "উপপাতানিক" বলে আখ্যা দিয়েছেন। মনু আরো বলেছেন যে ছাত্র অর্থ দেয় এবং যে শিক্ষক অর্থ গ্রহণ করে তারা একইভাবে দু'জনই অপরাধী। সমাজে এসব ছাত্র শিক্ষকদের নিন্দার চোখে দেখা হতো এবং সমাজের শ্রদ্ধানুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা উচিত বলে মনে করতো । এছাড়া প্রাচীন ইতিহাস থেকে আরো উল্লেখ পাওয়া যায় যে, শিক্ষা শেষ করার পর ছাত্র তার ইচ্ছামত জমি, সোনা, গরু, ঘোড়া,ছাতা, কাপড়, তরকারী ইত্যাদি উপহার দিত। [৪৩] এছাড়া অন্য গ্রন্থ থেকে ধারণা করা যায় পাক-ভারতে ব্যবস্থা তেমন ফলপ্রসূ ছিল না। গুরুরা সমাজের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রয়োজনত বিদ্যালয় খুলতেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এসে সেখানে ভিড় জমাতো। কারণ নালন্দা, বলভী, বিক্রমশিলা ওদন্তপুরি এসব বড় বড় বিদ্যালয়গুলো সে সময় স্থাপিত হয় নি। একইভাবে ছাত্ররা গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে বিদ্যা শিক্ষা শুরু করতেন এবং গুরুও ছাত্রদের মেধানুসারে নানা প্রকার শাস্ত্র ও শিল্প শিক্ষা দিতেন। সত্য, ধর্ম, ত্যাগ সংঘম ও অধ্যাবসায়ের উপর তাদের সাফল্য নির্ভর করতেন। [৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক গ্রন্থ থেকে জানা যায় সে সময়ে জ্ঞানচর্চার কিংবা উচ্চ শিক্ষার জন্য তক্ষশিলা, বারাণসী এবং কাঞ্চী বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে বারাণসী ছিল ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এবং তক্ষশিলা ছিল বৈষয়িক শিক্ষার জন্য। তক্ষশিলার স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন বিদ্যা শিক্ষার জন্য।[৪৫] এখানকার শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ত্রিবেদ শিক্ষা গ্রহণ করতো এমন নয় ত্রিবেদের পাশাপাশি জ্ঞানের আঠারটি শাখায় তাদের শিক্ষা দান করা হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৬] জাতক সাহিত্যের সবর্বদংষ্ট্র জাতক (জাতক নং-২৪১) থেকে ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

জাতক সাহিত্যে তক্ষশিলা ছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থায় বারাণসীও বেশ প্রসিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়। সেখানকার দরিদ্র বালকের ভরণপোষণও শিক্ষাদানের সমস্ত ব্যবস্থা করতেন বারাণসীগণ। সেসব দরিদ্র ছাত্রদেরকে 'পুণ্যশিষ্য' নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষে এক শ্রেণির ধনী মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের সন্তানের শিক্ষাদানের জন্য নিজ গৃহে শিক্ষক নিয়োজিত করতেন। তারা শিক্ষকদের ভরণপোষণ অর্থ, বেতন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। [৪৭] জাতক সাহিত্য ও মিলিন্দ প্রশ্ন [৪৮] থেকে জানা যায় গুরুকে 'আচারিয়' এবং শিষ্যকে 'অন্তেবাসিক' বলা হতো। বৌদ্ধ বিনয় পিটকে 'আচারির্য-আন্তেবাসিক' বা গুরু-শিষ্যের প্রতিপালনীয় বিষয় বা দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো বিষদভাবে আলোচনা দৃষ্ট হয়।

জাতকে বারাণসী সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, সেখানকার সম্ভ্রান্ত বংশীয়, ব্রাহ্মণ কুমারেরা, রাজুকমার ও শ্রেষ্ঠীপুত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় আসতেন। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে শিক্ষা শেষে সর্বশাস্ত্রবিদ হয়ে কেউ অধ্যাপনা এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতেন। রাজগৃহের অন্যতম জীবক কুমার তক্ষশিলা হতে চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করে বুদ্ধের চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বারাণসী ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে সমাদৃত ছিল। নগরের এক পার্শ্বে গুরুগৃহই পাঠশালারূপে গণ্য হতো। গুরুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভরণপোষণ, খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বারাণসীর অধিবাসীরা বহন করতেন। বারাণসীতে পাঁচশত ছাত্র একসাথে বিদ্যাপাঠ করতেন। জাতকে বারাণসীকে অন্যতম বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তক্ষশিলার মধ্যে এমন কিছু বিষয় ছিল যা সারা ভারতের অন্য কোথাও ছিল না।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

নালন্দা সম্পর্কে হিউয়েন সাঙের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ছয় জন রাজা ছয়টি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সব অট্টালিকাকে একটি বৃহৎ বিহার আকার দেওয়ার জন্য সেগুলোকে একটি ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছিল এবং সবগুলো অট্টালিকার জন্য একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছিল। এছাড়া সেখানে অনেকগুলো অঙ্গন ছিল এবং সেগুলো আটটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। হিউয়েন সাঙ নালন্দা সম্পর্কে আরো বলছেন ভারতে বহু সহস্র বিহার ছিল, কিন্তু তাদের কোনটাই জাঁকজমকে নালন্দাকে অতিক্রম করতে পারে নাই। অতিথি এবং অতিথি সেবক মিলিয়ে সেখানে সব সময় দশ হাজারের মতো ভিক্ষু থাকতেন। সেখানে তারা মহাযান বৌদ্ধধর্ম, হীনযান বৌদ্ধধর্মের আঠারটি শাখা, বেদ, প্রাচীন শাস্ত্রাদি, ব্যাকরণ, ভেষজ বিজ্ঞান এবং অঙ্ক শাস্ত্রের চর্চা করতেন। নালন্দার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজা একশোর বেশী গ্রামের রাজত্ব তাকে দান করেছিলেন। এই আর্থিক আনুকূল্যের জন্য তাদের পক্ষে জ্ঞানরাজ্যের এই সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছিল। কোশাম্বী মনে করেন নালন্দার ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হয় হিউয়েন সাঙের বর্ণনার মধ্যে কোন অত্যুক্তি ছিল না। কিন্তু বসাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেননি। তিনি লিখেছেন নালন্দার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যা পাওয়া গেছে তাতে সেখানে এক হাজারের বেশী ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ বর্ণিত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বাস করতে পারত কিনা তাতে সন্দেহ ছিল। বিদেশ থেকে বহু ছাত্ররা নালন্দায় এসে ভিড় জমাতেন মনের সন্দেহ দূর করার জন্য এবং ফেরার সময় খুশী হয়ে দেশে ফিরে যেতেন। নালন্দার গুণাগুণ সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ আরো বলেছেন, "প্রতিষ্ঠা দিবস কাল থেকে শুরু করে সেখানে কেউ কোন দিন নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেনি।"

এছাড়া নালন্দা সম্পর্কে আরেক বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর কাছ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে মতামতের তারতম্যও দেখা যায়। ইৎ-সিং নালন্দার ছাত্র সংখ্যা তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজারের মতো ছিল বলেছেন। হিউয়েন সাঙ বলেছেন একশো গ্রামের কথা। অন্যদিকে ইৎ-সিং সেখানে দু'শো গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। ইৎ-সিং দশ বৎসর নালন্দায় ছিলেন বলে জানা যায় তাঁর দেখা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মনে হয় তখন বলভীর শিক্ষা কেন্দ্রটি ছিল নালন্দার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ইৎ-সিং নালন্দা এবং বলভীকে চীনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থেও বলভীর উল্লেখ পাওয়া যায়। [৫০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প এবং কারিগরি বিদ্যা বেশ উন্নত ছিল। শিল্প বিদ্যা সম্পর্কে জাতক সাহিত্যের পীঠ জাতকে (জাতক নং-৩৩৭) উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের এবং গ্রামের বাইরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গ্রামের শিল্পীরাই তৈরী করতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে পালি সাহিত্যে কিছু শিল্প দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র। বস্ত্রের মধ্যে তিন প্রকারের নাম পাওয়া যায়। ক. কৌসেয় বস্ত্র, খ. কাপাস বস্ত্র, গ. ক্ষৌম বস্ত্র। কাঠের তৈরী বিভিন্ন প্রকারের ধাতব পদার্থও পাওয়া যেত যেমন- লৌহ, তামা, সীসা, স্বর্ণালংকার। আরও পাওয়া যেত পাথরের রকমারি জিনিস পত্র কাচেঁর দ্রব্য, অস্থি ও হাতির দাঁতের জিনিসপত্র, প্রসাধনী, তৈল ও তরল পদার্থ, চর্ম ও চর্মের তৈরী নানা প্রকারের সামগ্রী, মাটির দ্রব্য যেমন-পাত্র ফলক এবং ইট প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও অন্যান্য জিনিষপত্রের মধ্যে ছিল মালা, নল, সংগীত-সরঞ্জাম, ঝুড়ি, চিরুনি, সুচি, রং, চিত্রকর্ম ইত্যাদি। [৫১] শিল্প সম্পর্কে ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতকে আঠারো প্রকারের শিল্পের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। স্ট্রাবো সোনা এবং পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ্যারিয়ান তুলোর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ভারতীয়রা উন্নতমানের তুলার তৈরি পোষাক ব্যবহার করতো । এ থেকে অনুমান করা যায় ভারতে সে সময় থেকে কার্পাস শিল্প চালু ও উন্নত ছিল। সে সময়ে চর্মশিল্পের বেশ উন্নতি ছিল কারণ এ্যারিয়ান ভারতীয়দের চামড়া জুতা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সে সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বস্ত্র ও রেশম শিল্পের কথা জানা যায় আর তখন থেকে ভারতের অসহায় মহিলারা জীবন-জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছিল। এদিকে মেগাস্থিনিস প্রাচীন ভারতীয়দের পাঁচটি ধাতু ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন সোনা, রূপা, তামার পরিমাণ যেমন কম নয়, তেমনি লোহা ও টিনের ব্যবহারেরও কোন কমতি ছিল না। এসব ধাতুগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অলংকার ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ কাজে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হতো। এ্যারিয়ান বলেছেন, ভারতীয়রা সে সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ অলংকার ব্যবহার করতেন এবং যারা উচ্চ শ্রেণি কিংবা বিশেষ করে ধনী পরিবারের মানুষেরা হাতীর দাতেঁর বিভিন্ন অলংকার ব্যবহার করতো ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সংগঠনের মূলে ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র ছিল শিল্পের বৃহত্তম একক উদ্যোক্তা এবং এক্ষেত্রে তার মৌলিক এক চেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র সযত্নে রক্ষা করতো । তাই শিল্পকে সযত্নে

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা করার জন্য সরকারের একটি পৃথক খনি দপ্তর ছিল এবং রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস হিসাবে খনিগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। উল্লেখিত খনিগুলোর মধ্যে ছিল সোনা, রুপা, হীরা মণিমুক্তা, মূল্যবান পাথর, তামা, সীসা, লোহা, টিন ইত্যাদি। এছাড়াও সামুদ্রিক খনি এবং তেলের খনি ছিল। সামুদ্রিক খনি থেকে মহামূল্যবান মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ও প্রবাল পাওয়া যেত এগুলো রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। লবণ উৎপাদনেও রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিমাণ অধিকার ভোগ করতো । সে সময়ে রাষ্ট্রের নিজস্ব কাপড়, তেল ও চিনির কারখানা ছিল, মদ উৎপাদন এবং বিক্রয় এটির রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের মধ্যেই ছিল। এছাড়া অস্ত্র, নৌকা, জাহাজ এবং মুদ্রা তৈরিতে রাষ্ট্র অধিকার ভোগ করতো ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সমৃদ্ধির পেছনে কাঁচামালের যোগান অনেকখানি অবদান রেখেছিল। সে সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল বা গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য নগরে আমদানী করা হতো। তখনকার সময় একেক গ্রামে একেক শিল্পীরা বসবাস করতো অর্থাৎ এক গ্রাম ছিল কর্মকারের, আরেক গ্রাম কুম্ভকারের, আবার কোন গ্রাম বা অঞ্চল তাতী, অন্য রাস্তার হাতির দাতেঁর কারিগর, কোন রাস্তায় রঞ্জন শিল্পীরা বাস করতো । জৈন গ্রন্থে [৫২] সদ্দালপুত্ত নামে একজন ধনী কুম্ভকারের নাম জানা যায়, যিনি পাঁচশ কারখানার মালিক ছিলেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় পণ্য পরিবহণের জন্য তাঁর একটি বিরাট নৌবহরের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সামগ্রীর মধ্যে বস্ত্র শিল্পের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। দেশে এবং বিদেশে এ শিল্পের কদর ছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যে এর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। রেশম, মসলিন, ক্যালিকো, লিলেন এবং পশম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। শিক্ষা সমুচ্চয় ছিল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ। সেখান থেকে সর্বোৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রের জন্য বারাণসীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। [৫৩] এছাড়াও প্রাচীনকাল থেকেই বারাণসী নগর ছিল কাসি কাপড় এবং চন্দন কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ। বারাণসীর তৈরী কাপড় পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও নগরে চালান দেওয়া হতো। [৫৪] এছাড়া উল্লেখিত মদীয়ক জাতকে [৫৫] কাশীর কাপড়ের কথা জানা যায় এবং কাষায় জাতকে [৫৬] হাতির দাতেঁর বিভিন্ন প্রশংসার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ভারতীয় জনসাধারণ যে বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরি বিন্যাসে উন্নত ছিল সেটা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পেয়েছি। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামের শিল্পী ও কারিগরেরাই প্রস্তুত করতো । [৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা

প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্য শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের তুলনায় নারীরা কম-অগ্রণী ছিলেন না। অর্থাৎ জাতক সাহিত্যে থেকে নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে অর্থাৎ কিভাবে বিদ্যার্জন করেছিল তার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখিত খুল্লকালিঙ্গ জাতকে [৫৯] নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে থেরীগাথা থেকে জানা যায় বুদ্ধের সময়ে ধর্মীয় পথে ও শিক্ষাদীক্ষায় পুরুষের ন্যায় ধর্ম, সাধনা ও শাস্ত্রচর্চায় নারীরাও বেশ অগ্রগতি ভূমিকা রেখেছিলেন। নারীরা ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা, সংঘে প্রবেশ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় নারীরাও সংঘজীবন যাপনের অধিকার গ্রহণ করে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভে সুযোগ সুবিধা অর্জন করেছিলেন। নারীদের মধ্যে অনেকেই কেউ ধর্ম প্রচার করতেন, কেউ সমাজ সেবায় নিয়োজিত থাকতেন, কেউ ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকতেন। তন্মধ্যে ক্ষেমা প্রজ্ঞায়, উৎপলবর্ণা ঋদ্ধিবলে, নন্দা ধ্যান মার্গে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী অভিজ্ঞাতায়, সকুলা দিব্যদৃষ্টিতে, সোনা আরদ্ধবীর্যে এবং ভদ্রাকুণ্ডলকেশী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সর্বোচ্চ ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য এমন অনেক নারী ছিল যাঁরা ধর্ম-দর্শনে এবং যুক্তিতর্কে পণ্ডিত ছিলেন। সে সময়ের নারীরা ধর্মদেশনাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। [৫৯]

সে সময়ে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার কথাও জানা যায় এবং সেখানে তারা তাদের মানসিক বিকাশের সুযোগ লাভ করতেন। রাজগৃহ নগরের ধর্মদিন্না নাম্নী এক মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্মৃতি শক্তিসম্পন্না। সে সময় স্মৃতিচারণ ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানাহরণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই শাস্ত্রাকারে পুস্তকাদি থাকলেও শ্রুতিপরম্পরায় গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। থেরীগাথায় ধর্মদিন্নাকে শিক্ষাদানে সর্বাপেক্ষা সুনিপণা 'ধর্মকথিকা' বলা হয়েছে। ধর্মদিন্নার স্বামী বিশাখ তাকে বৌদ্ধধর্মের মূলতন্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেছিলেন এবং তথাগত বুদ্ধ তাকে প্রশংসা করেছিলেন। শুক্লা ছিলেন অন্যতম ধর্মপ্রচারিকা ও সুভাষিতা নারী। তিনি ধর্মবাণী এবং ধর্মকথা অত্যন্ত সহজ, সরল ও সুললিত কণ্ঠে ব্যক্ত করতেন। [৬০] অন্যদিকে ভদ্রাকুণ্ডলকেশী একজন বক্তা এবং ধর্মদেশনায় সুনিপুণা ছিলেন যার ফলে তিনি অঙ্গ, মগধ, বৃজি, কাশী, কোশল প্রভৃতি রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। [৬১]

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা সম্পর্কে ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নের যেই প্রবেশদ্বার ছিল, সেটা বহু প্রাচীন যুগে নারীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাদের শিক্ষা লাভের পথ মোটামুটি বন্ধই ছিল। অথর্ববেদের মতে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নারীরা স্বামী লাভ করেন এ ব্রহ্মচর্য হলো কোন ব্রত বা শিবপূজোর মতোই।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী লাভ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদে কিছু ঋষিকার নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। যেমন, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা ও গোধা প্রভৃতি। পাণিনিতে আচার্যা, উপাধ্যায়া শব্দের বুৎপত্তিতে অধ্যাপনায়রত নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশিকাভাষ্যে কাশকৃৎস্না ও আপিশলার নাম পাই মীমাংসা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত বলে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শ্বাশতীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মাঝে মধ্যে হয়তোবা কোনো কোনো নারী শিক্ষার অধিকার পায়নি কারণ ক্রমেই তা সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই সে সময়কার শিক্ষিত নারী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "স্ত্রিয়ঃ সতীঃ তা উ যে পুংসঃ আহুঃ" অর্থাৎ নারী হয়ে তারা পুরুষ। যাহোক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। নারীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যেত। পরবর্তীতে নারীদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না একমাত্র গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোনো নারীর অধিকার ছিল না। [৬২]

উপসংহার

প্রাচীন ভারতবর্ষের নর-নারীদের জন-জীবন এবং বিবাহ প্রথার মধ্যে বহু প্রকার বিবাহের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনযুগে রাজকূলের মধ্যেও বহু বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। সে সময়ে পুরুষরাই যে শুধুমাত্র সিংহাসন লাভ করতেন তা নয়, নারীরাও সিংহাসন লাভ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। পুরুষদের মতো নারীদেরও একাধিক পতিগ্রহণের কথা জানা যায়। সে সময়কার নর-নারীরা ঘর-সংসার, বিপুল ঐশ্বর্য, ধন, ত্যাগ করেও ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয় শিল্পবিদ্যা শিক্ষা এবং সমাজ জীবনের নানাবিধ কর্মেও তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

তথ্য নির্দেশনা

১. জাতক সন্দর্শন, প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ২৫।

২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(২য় খণ্ড) ঃ সুনীল চট্টোপাধ্যায়; পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ কলকাতা, ১৯৯৭ (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ. ৫৪-৫৫।

৩. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৫।

৪. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫. থেরী গাথাঃ বেলু রানী বড়ুয়া; বাংলাদেশ রিচার্স ফর বুড্ডিস্ট ষ্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৬।

৬. জাতক সন্দর্শনঃ পৃ. ২৫-২৬।

৭. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-১৫২।

৮. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৩৫৪।

৯. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩৫৯।

১০. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ পৃ. ১১১।

১১. জাতক, (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪১৫।

১২. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (ষষ্ঠ মুদ্রণ), জাতক নং-৭।

১৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৫৮।

১৪. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং- ১০৮।

১৫. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩০৬।

১৬. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. উপক্রমণিকা।

১৭. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৫ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৫৩১।

১৮. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১১ (চতুর্থ মুদ্রণ) জাতক নং-৪৬১।

১৯. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং ৪৭২।

২০. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৫৭-৫৮।

২১. থেরীগাথাঃ পৃ. ১৫-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

২২. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং -৪৫৮।

২৩. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ উপক্রমণিকা।

২৪. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৫৯।

২৫. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. উপক্রমণিকা।

২৬. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩২৮।

২৭. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪০৮।

২৮. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৪৩।

২৯. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং- ৫৩২।

৩০. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৬০-৬১।

৩১. থেরীগাথা ঃ পৃ. ১১-১২।

৩২. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যানঃ সুনন্দা বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯।

৩৩. প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্যঃ সুকুমার ভট্টাচার্য; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৪ বাংলা, পৃ. ৩০-৩২।

৩৪. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৩৬।

৩৫. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৬৫-৬৮।

৩৬. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ৩১-৩২।

৩৭. জাতক ২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-১৬২।

৩৮. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৬৮।

৩৯. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪১।

৪০. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-১৬৩।

৪১. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-২৫২।

৪২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৬৫।

৪৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৬।

৪৪. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ ডক্টর রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা আগষ্ট ১৯৮০, পৃ. ২৭০।

৪৫. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগর জীবনঃ করুণানন্দ ভিক্ষু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা জুন, ১৯৯৪, পৃ. ৬৫-৬৬।

৪৭. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ৩২।

৪৮. মহাবর্গ ঃ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির; ৬/এ নিউ বহুবাজার লেন, কলকাতা ১৯৩৭, পৃ. ৬৭।

৪৯. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ. ২৭১।

৫০. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৭১-৭২।

৫১. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৬০।

৫২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ পৃ. ৭৯-৮৩।

৫৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৩।

৫৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৬০।

৫৫. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত, জাতক নং-৩৯০।

৫৬. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-২২১।

৫৭. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ. ৩২।

৫৮. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩০১।

৫৯. থেরীগাথা ঃ পৃ. ২৬-২৭।

৬০. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ. ৬৮।

৬১. থেরী গাথা ঃ পৃ. ২৬-২৭।

৬২. প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য ঃ পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জাতক সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভূমিকা

পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে জাতক সাহিত্যের নানা স্থানে প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। এসব তথ্যের সঙ্গে পালি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করে এ অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলো।

জাতকে প্রকৃতি

প্রকৃতি বলতে প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতক সাহিত্যে বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, জলাশয়, গঙ্গা, সমুদ্র, সাগর, বৃক্ষ, ঋতু এসকল উপাদন নিয়েই প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো জাতক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে এবং মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থেও [১] ঋতু, এবং হিমালয় পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জানা যায়। নিম্নে জাতক সাহিত্যের আলোকে জাতকের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

ক. জাতকে পর্বত, হিমালয়, নদী,হ্রদ, জলাশয়, গঙ্গা

পর্বত- (দর্দ্দর জাতক, জাতক নং-৩০৪, কাশ্যপমান্দ্য জাতক, জাতক নং-৩১২, শশ জাতক, জাতক নং-৩১৬)

নদী- (শশ জাতক, জাতক নং-৩১৬)।

গঙ্গা- (বানর জাতক, জাতক নং-৩৪২)।

গৃধ্রকুট পর্বত- (গৃধ্র জাতক, জাতক নং-৪২৭)।

শাল্মলিদ্রুহ হ্রদ- (কাকবতী জাতক, জাতক নং-৩২৭)।

সিংহপ্রতাপ হ্রদ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

অনবতপ্ত হ্রদ- (শ্রীকালকর্ণী জাতক, জাতক নং-৩৮২)।

অরঞ্জর পর্বত- (ইন্দ্রিয় জাতক, জাতক নং-৪২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

কেবুক নদী- (কাকবতী জাতক, জাতক নং-৩২৭)।

ক্ষেম সরোবর- (মহাহংস জাতক, জাতক নং-৫৩৪)।

সমুদ্র- (সমুদ্র জাতক, জাতক নং-২৯৬, দদ্দভ জাতক, জাতক নং-৩২২)।

সুদর্শন পর্বত- নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

তেলবাহ নদ- (সেরিবাণিজ জাতক, জাতক নং-৩)।

পূর্ণনদী- (পূর্ণনদী জাতক, জাতক নং-২১৪)।

এণিনদী- (বকব্রহ্ম জাতক, জাতক নং-৪০৫)।

মহানদী- (খুল্লকালিঙ্গ জাতক, জাতক নং-৩০১)।

শতোদকা নদী- (ইন্দ্রিয় জাতক, জাতক নং-৪২৩)।

কাকনেরু পর্বত- (ভূরিদত্ত জাতক, জাতক নং-৫৪৩)।

কালপর্বত- (বিদূরপণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

কেতুমতী নদী- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

কোন্তিমারা নদী- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

জম্বু নদী- (বিদূরপণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

বৈপুল্য পর্বত- (দুর্মেধা জাতক, (২), জাতক নং-১২২)।

নালিক নদী- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

নিসভ পর্বত- (ভূরিদত্ত জাতক, জাতক নং-৫৪৩)।

নেমিন্ধর পর্বত- (নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

বৈভার পর্বত- (বিদূরপণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

মুচলিন্দ সরোবর- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

মৃগসম্মতা নদী- (শ্যাম জাতক, জাতক নং-৫৪০)।

যুগন্ধর পর্বত- (নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

সীদা নদী- (নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

সীদা সমুদ্র- (নেমি জাত, জাতক নং-৫৪১)।

Dhaka University Institutional Repository

করবীক পর্বত-(নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

কালপর্বত- (বিদূর পণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

সুবর্ণ গিরিতাল পর্বত- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

সোতুম্বরা নদী- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

অচিরবতী নদী- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

গঙ্গা, যমুনা, সরযু ও মাহী নদী- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

কর্ণমুণ্ড হ্রদ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

কুণাল হ্রদ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

কৃষ্ণা নদী- (শঙ্খপাল জাতক, জাতক নং-৫২৪)।

ক্ষার নদী- (সংকৃত জাতক, জাতক নং-৫৩০)।

ক্ষেমা নদী- (নলিনিকা জাতক, জাতক নং-৫২৬)।

এ্যর্গল হ্রদ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

মন্দাকিনী হ্রদ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

ষড়দন্ত হ্রদ- (ষড়দন্ত জাতক, জাতক নং-৫১৪)।

রথকার হ্রদ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

রোহিণী নদী- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

শঙ্খপাল হ্রদ- (শঙ্খপাল জাতক, জাতক নং-৫২৪)।

মানুষিক সরোবর- (খুল্লহংস জাতক, জাতক নং-৫৩৩।

অশ্বকর্ণ পর্বত- (নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

ইষাধর পর্বত- (নেমি জাতক, জাতক নং-৫৪১)।

শাতোদিকা নদী- (শরভঙ্গ জাতক, জাতক নং-৫২২)।

মানুসিক সরোবর- (খুল্লহংস জাতক, জাতক নং-৫৩৩)।

গ্যালিলী হ্রদ- (শীলানিংশস জাতক, জাতক নং-১৯০)।

Dhaka University Institutional Repository

হিমালয় পর্বত- (নৃত্য জাতক, জাতক নং-৩২, চন্দকিন্নর জাতক, জাতক নং-৪৮৫, পূতিমাংস জাতক, জাতক নং-৪৩৭)

মানুষিক সরোবর- (খুল্লহংস জাতক, জাতক নং-৫৩৩)।

খ. জাতকে ঋতু

বর্ষাকাল- (কাশ্যপমান্দ্য জাতক, জাতক নং-৩১২, কুটীদূষক জাতক, জাতক নং-৩২১, পরসহস্র জাতক, জাতক নং-৯৯, তর্কারিক জাতক, জাতক নং-৪৮১, কোমায় পুল্ল জাতক, জাতক নং-২৯৯।

শীত- (মারুত জাতক, জাতক নং-১৭)।

গ্রীষ্মকাল- (বক জাতক, জাতক নং-৩৮)।

গ. জাতকে বৃক্ষ

শালবৃক্ষ- (ক্ষান্তিবাদী জাতক, জাতক নং-৩১৩, ত্রিশকুন জাতক, জাতক নং-৫২১)।

তালবৃক্ষ- (দদ্দভ জাতক, জাতক নং-৩২২)।

বিল্ববৃক্ষ- (দদ্দভ জাতক, জাতক নং-৩২২)।

আম্ববৃক্ষ- (কোকালিক জাতক, জাতক নং-৩৩১)।

উড়ুম্বর বৃক্ষ- (বানর জাতক, জাতক নং-৩৪২, মহাশুক জাতক, জাতক নং-৪২৯)।

বটবৃক্ষ- (আয়াচিত ভক্ত জাতক, জাতক নং-১৯)।

সপ্তপর্ণী বৃক্ষ- (কুরুঙ্গমৃগ জাতক, জাতক নং-২১।

শাল্মলি বৃক্ষ- (কুলায়ক জাতক, জাতক নং-৩১)।

কিম্ফল বৃক্ষ- (ফল জাতক, জাতক নং-৫৪)।

মঙ্গল বৃক্ষ- (ভদ্রশাল জাতক, জাতক নং-৪৬৫)।

পলাশবৃক্ষ- (স্পন্দন জাতক, জাতক নং-৪৭৫, পলাশ জাতক, জাতক নং-৩০৭)।

অর্জ্জুন বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

বরুণ বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

ক্ষীর বৃক্ষ- (মৃদুলক্ষণা জাতক, জাতক নং-৬৬)।

অধ্যারূঢ় বৃক্ষ- (কোটিশাল্মলি জাতক, জাতক নং-৪১২)।

তিমির বৃক্ষ- (সুশ্রোণি জাতক, জাতক নং-৩৬০)।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বকর্ণ বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

অসন বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

উদ্দালক বৃক্ষ- (বিদূরপণ্ডিত জাতক, জাতক নং-৫৪৫)।

কচ্চিকার বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

করঞ্জ বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

কারবৃক্ষ- (মূকপঙ্গু জাতক, জাতক নং-৫৩৮)।

কন্দূরু বৃক্ষ- (বিশন্তর জাতক, জাতক নং-৫৪৭)।

কোল বৃক্ষ- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫২২)।

ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ- (কোটিশাল্মলি জাতক, জাতক নং-৪১২)।

তিন্দুক বৃক্ষ- (তিন্দুক জাতক, জাতক নং-১৭৭)।

রুচি বৃক্ষ- (কুশনালী জাতক, জাতক নং-১২১)।

ঘ. জাতকে পশু

সিংহ- (দদ্দভ জাতক, জাতক নং-৩২২, দর্দ্দর জাতক, জাতক নং-১৭২, জম্বুক জাতক, জাতক নং-৩৩৫, শৃগাল জাতক, জাতক নং-১৫২, শূকর জাতক, জাতক নং-১৫৩, গুণ জাতক, জাতক নং-১৫৭)

মেষ- (চর্ম্ম শাটক জাতক, জাতক নং-৩২৪)।

গাধা- (গোধা জাতক, জাতক নং-৩২৫)।

ময়ূর- (বারেরু জাতক, জাতক নং-৩৩৯, ময়ূর জাতক, জাতক নং-১৫৯)।

গৃধ্র- (গৃধ্র জাতক, জাতক নং-৪২৭, গৃধ্র জাতক, জাতক নং-১৬৪)।

ছাগ- (পূতিমাংস জাতক, জাতক নং-৪৩৭)।

মৃগ- (লক্ষণ জাতক, জাতক নং-১১, খরাদিয়া জাতক, জাতক নং-১৫, ত্রিপর্য্যস্তমৃগ জাতক, জাতক নং-১৬)।

হরিণ- (ন্যাগ্রোধমৃগ জাতক, জাতক নং-১২)।

সিংহ ও ব্যাঘ্র- (মারুত জাতক, জাতক নং-১৭)।

কুরঙ্গ মৃগ- (কুরুঙ্গমৃগ জাতক, জাতক নং-২১)।

Dhaka University Institutional Repository

কুক্কুর- (কুক্কুর জাতক, জাতক নং-২২)।

গো-জন্ম- (নন্দিবিলাস জাতক, জাতক নং-২৮, কৃষ্ণ জাতক, জাতক নং-২৯, মুণিক জাতক, জাতক নং-৩০, শালূক জাতক, জাতক নং-২৮৬)।

বানর- (বানরেন্দ্র জাতক, জাতক নং-৫৭, ত্রয়োধর্ম্ম জাতক, জাতক নং-৫৮, তিন্দুক জাতক, জাতক নং-১৭৭, চুল্লনন্দিক জাতক, জাতক নং-২২২)।

হস্তি- (দুর্মেধা (২) জাতক, জাতক নং-১২২, কাষায় জাতক, জাতক নং-২২১)।

মূষিক- (বিড়াল জাতক, জাতক নং-১২৮)।

গোধা যোনিতে- (গোধা জাতক (১), জাতক নং-১৩৮, গোধা জাতক (২), জাতক নং-১৪১)।

শৃগাল- (শৃগাল জাতক (২), জাতক নং-১৪২, শৃগাল জাতক (৩), জাতক নং-১৪৮)।

মহিষ- (মহিষ জাতক, জাতক নং-২৭৮)।

শরভমৃগ যোনিতে- (শরভমৃগ জাতক, জাতক নং-৪৮৩)।

কচ্ছপ- (কচ্ছপজাতক, জাতক নং-১৭৮)।

কর্কট- (কর্কট জাতক, জাতক নং-২৬৭)।

কুম্ভীর- (কুম্ভীর জাতক, জাতক নং-২২৫)।

কুরঙ্গমৃগ- (কুরঙ্গ জাতক, জাতক নং-২০৬)।

শশক, শল্যক, গোধা, গণ্ডার, কচ্ছপ- (মহাসুতসোম জাতক, জাতক নং-৫৩৭)।

ঙ. জাতকে পাখী

কাষ্ঠকুট্র পাখী- (জব শকুন জাতক, জাতক নং-৩০৮)।

পাখী- (কুটীদূষক জাতক, জাতক নং-৩২১)।

কোকিলা- (কোকালিক জাতক, জাতক নং-৩৩১)।

শুক পক্ষী- (মহাশুক জাতক, জাতক নং-৪২৯)।

বর্ত্তকরূপে- (বর্ত্তক জাতক, জাতক নং-৩৫, শকুনঘ্নী জাতক, জাতক নং-১৬৮)।

পক্ষি জন্ম- (শকুন জাতক, জাতক নং-৩৬, অনুশাসক জাতক, জাতক নং-১১৫)।

তিত্তির, মর্কট, হাতী- (তিত্তির(১) জাতক, জাতক নং-৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

বক- (বক জাতক, জাতক নং-৩৮)।

পারাবত- (কপোত জাতক, জাতক নং-৪২, রোমক জাতক, জাতক নং-২৭৭, কাক জাতক, জাতক নং-৩৯৫)।

সুবর্ণহংস- (সুবর্ণহংস জাতক, জাতক নং-১৩৬)।

কাক- (কাক জাতক (১), জাতক নং-১৪০, সুপত্ত্র জাতক, জাতক নং-২৯২, কাক জাতক (১), জাতক নং-১৪০)।

উদক কাক- (বীরক জাতক, জাতক নং-২০৪)।

হংস- (জবনহংস জাতক, জাতক নং-৪৭৬, হংস জাতক, জাতক নং-৫০২)।

কুণাল পক্ষি- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

শারিক- (শারিক জাতক, জাতক নং-৩৬৭)।

তৃণহংস- (মহাহংস জাতক, জাতক নং-৫৩৪)।

সুহেমা হংসী- (মহাসুতসোম জাতক, জাতক নং-৫৩৭)।

কন্দগলক পক্ষী- (কন্দগলক জাতক, জাতক নং-২১০)।

বারণপক্ষী- (কুণাল জাতক, জাতক নং-৫৩৬)।

প্রকৃতি ও পরিবেশ ও সচেতন সম্পর্কে বুদ্ধের উক্তি

গৌতমবুদ্ধের সাথে প্রকৃতি এবং পরিবেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাই বৌদ্ধধর্ম পরিবেশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং একইভাবে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হচ্ছে প্রকৃতি এবং পরিবেশ। গৌতমবুদ্ধ রাজপুত্র হয়েও তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন উন্মুক্ত আকাশের নীচে লুম্বিনী কাননের বটবৃক্ষ তলে। তথাগত জন্মগ্রহণ করেই প্রথমে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করলেন এবং মৃত্যুর সময় অর্থাৎ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন মল্লদের শালবনে। বুদ্ধের সাথে প্রকৃতির এতই নিবিড় সখ্যতা ছিল যে রাজপুত্র হয়েও রাজপ্রসাদের কোন আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন না। তিনি বিভিন্ন গাছের নীচে কিংবা বৃক্ষমূলে বসে প্রকৃতিকে খুবই মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন। বুদ্ধ ২৯ বৎসর বয়সে বিবাহ আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বিবাহের কিছুদিন পর একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। সংসার এবং পুত্রের মায়া ত্যাগ করে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। গৃহত্যাগ করেও তিনি বনে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ালেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সদগুরুর দর্শন লাভের আশায় কখনও বৃক্ষতলে, কখনও কোন পাহাড়ের পাদদেশে রাত দিন অতিবাহিত করতেন। এভাবে তিনি পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিজের সাথে একাত্ম করে নিয়ে একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসেবে তিলে তিলে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অবশেষে তিনি গিয়ে পৌঁছালেন গয়ার উরুবিল্ব নামক স্থানে, বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত। তিনি এমন একটা সুনিবিড় অরণ্য পরিবেশ পছন্দ করে নিলেন যেখানে সাধক চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের জন্য খুবই উপযোগী ছিল। তিনি সেখানকার এক বৃহদাকার বটবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হলেন। তাঁর ধ্যানের বিষয় ছিল জীবনের পরিণতিতে জীব জগতের সকল সত্ত্বা কেন দুঃখ ভোগ করে। [২] 'জীবনের পরিণতি মৃত্যু'-এটা চিরন্তন সত্য। এই সত্যটা সবাই জেনে্ও কেন স্বজনের মৃত্যুতে হাহাকার করে। জীবনের পরিণতি অর্থাৎ জীবন মানেই জরা–ব্যাধি -বার্ধক্য ও মৃত্যু এগুলো সবই থাকবে। [৩] এই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য বটবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ব্যাপী কঠিন সাধনায় রত ছিলেন। দীর্ঘদিন বনে প্রান্তরে প্রকৃতিচারী থাকাকালে তিনি কোন রোগে আক্রান্ত হননি। প্রকৃতি ছিল তাঁর অন্তর। কারণ প্রকৃতির উপর এমনই মমত্ববোধ ছিল এজন্য প্রকৃতির কাছে বুদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাই বৌদ্ধধর্মে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতির ফুল, ফল, পুষ্প বৃক্ষ, ডাল গুল্ম, লতা-পাতা প্রভৃতির পূজার এই রেওয়াজ প্রবাহমান। তাই বৌদ্ধ ধর্ম বলে জগতের অন্যান্য কিছু হতে প্রকৃতি ও পরিবেশ হলো জন্ম-জন্মান্তরে মানুষের পরম বন্ধু।[৪]

বুদ্ধ প্রকৃতি ও পরিবেশকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বলেছেন। তিনি ভিক্ষুসংঘের আবাসিক স্থান সংঘারামকে পরিষ্কার সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। যেমন-ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহ হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। শীতকালে দিনের বেলাতে জানালা খুলে রাখতে হবে এবং রাতে বন্ধ রাখতে হবে। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় জানালা বন্ধ রাখতে হবে এবং রাতে জানালা খুলতে হবে। আবাসিক স্থানের আশেপাশে সব সময় ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। ঝাঁট দেওয়ার সময় ধূলিকণা বায়ুতে মিশে না যায় সেদিকে খেয়াল রেখে পানি ছিটিয়ে ঝাঁট দিতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গা ময়লা-আবর্জনা ফেলতে হবে। দরকার হলে আবর্জনাকে আগুন অথবা পানি দিয়ে বিনাশ করতে হবে। পানীয় জল ছেকে পান করতে হবে। এভাবে বহু উপদেশ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য। [৫]

Dhaka University Institutional Repository

তথাগত প্রকৃতির মোহে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এজন্য প্রকৃতির সাথে চলার জন্য কিছু আচরণমূলক উপদেশও দিয়েছিলেন যেমন ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন গাছকে ছেদন, কর্তন ও সংহার করা যাবে না। ভিক্ষুদের চতুর্বিধ আশ্রয়ের অন্যতম আশ্রয় হয় বৃক্ষতল। বুদ্ধ বলেছেন এই চতুর্বিধ আশ্রয়কে গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে। [৬]

বুদ্ধ ধর্ম প্রচারকালেও ভিক্ষুসংঘকে প্রকৃতির অনুকূল অবস্থায় ভ্রমণ করতে বলেছেন। তাদেরকে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে এই পরিভ্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বর্ষাকালে পরিভ্রমণ করার সময় বহু সবুজ তৃণ, ছোট-ছোট চারাগাছ পদদলিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আবার রাস্তা-ঘাটে চলাচলের সময় বৃক্ষের গোড়া ঘেঁসে কিংবা কোন বৃক্ষকে টেনে ধরে অথবা বৃক্ষের উপর নিজের ভারসাম্য দিয়ে চলাচল করতে থাকে। এতে বৃক্ষের অনেক ক্ষতি সাধন হয়। এটি বুদ্ধের কাছে অবিচার বলে মনে হয়। তখন তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন " একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব" (বৃক্ষ) [৭] এর উপর নিপীড়ন করা অবিধেয়। গৌতমবুদ্ধ এই বিষয়টিকে আরো গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং আরো সৃষ্টি করে অনুজ্ঞা প্রদান করলেন এবং বর্ষাকালীন সময়ে ভ্রমণ স্থগিত করে নিজ গৃহে ধর্ম সাধনা করতে হবে। শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে সেগুলো অনুশীলন করতে হবে। এভাবে ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে বর্ষাবাস যাপন প্রথা প্রচলন হলো। বর্ষাকালে অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিণী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস পুরা বর্ষাকালে ভিক্ষুসংঘ নিজ নিজ বিহারে থেকে ধ্যান জ্ঞানের সাধনা করবে। এই সময়টাকে ভিক্ষুসংঘের বর্ষাবাস ব্রত বলে।[৮] গৌতমবুদ্ধ প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাই তাঁর ধর্মদর্শন প্রচারকালে উপমা উদাহরণ হিসেবে প্রকৃতি ও প্রকৃতিয় বহু উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়।

মানুষের বিষয়াসক্তির পূর্ণাঙ্গ অবসান না হলে তা সময়ে সময়ে সজীব হয়ে গজিয়ে উঠে এবং তা মানুষের মনুষ্যত্ব্যকে গ্রাস করতে পারে। এই বিষয়টি বুদ্ধ ভেঙ্গে পড়া বৃক্ষের সাথে তুলনা করে বলেছেন। [৯]

এ সম্পর্কে বুদ্ধের উক্তি-

"যথাপি মূলে অনূপদ্দবে ফল্হে ছিন্নো' পি রুকখো পুনরেব রূহতি।
এবম্পি তণহানুসয়ে অনূহতে নিবত্ততি দুকখমিদং পুনপপুনং"।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কোনা বৃক্ষের মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে ভেঙ্গে পড়া গাছও যেমন মূল হতে আবার বেড়ে উঠে তেমনি মানুষ যদি তৃষ্ণার মূল হতে আবার বেড়ে উঠে তেমনি মানুষ যদি তৃষ্ণার মূল ছিন্ন না করতে পারে তাহলে দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হবে।

বুদ্ধ আবার তৃষ্ণার ক্রমবর্ধমান ভাবকে প্রকৃতির লতাগুল্মের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন-

সব্বন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্বিভজ্জ তিট্ঠতি।
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায় ছিন্দথ।[১১]

অর্থাৎ মানুষের অন্তরস্থিত তৃষ্ণা উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা ও লতাগুলোর ন্যায় দ্রুত বর্ধনশীল। জ্ঞানী লোকেরা সম্যক দৃষ্টিতে এই বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং এর মূলোচ্ছেদন করে। তাই প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় গৌতম বুদ্ধ তাঁর সম্যক সম্বোধি সাধনাকালে যে ছয় বছর প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করেছিলেন তখন তিনি প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন এর গতি প্রকৃতিকে। তাই তিনি গাছের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধের সেই প্রকৃতিকে উপলব্ধিই আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। [১২]

গৌতম বুদ্ধের নানা জন্ম

জাতকে যে সকল পশুপাখির নাম কিংবা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে দেখা যায় বোধিসত্ত্বই ছিলেন সেই পশুপাখি এবং তিনিই বিভিন্ন প্রকৃতি কিংবা বিভিন্ন অরণ্যে জন্মলাভকারী। আমরা আরো জানতে পারি রাজকুমার সিদ্ধার্থ মায়াদেবীর গর্ভে থেকে জন্মলাভ করেন লুম্বিনী উদ্যানে। জন্মের প্রথম থেকেই তিনি অরণ্যেই আশ্রয় নিলেন। তিনি রাজার পুত্র হয়েও রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেননি, মুক্ত আকাশে মুক্ত অরণ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমনিভাবে গৌতমবুদ্ধ যখন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে অরণ্যে চলে আসেন সেখানে কোথাও কোন জনমানব ছিল না। চারিদিকে নির্জন, শুধু পাখির কুজন আর বয়ে চলা বাতাসের শব্দ। গভীর অরণ্যেও গুহায় তাঁর বাসস্থান তৈরি হলো। এভাবে দিনের পর দিন তিনি বনে বনে দিন অতিবাহিত করেন । সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভ করার পূর্বে এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর বিভিন্ন অরণ্যে, বিভিন্ন স্থানে আবার তিনি পশুপাখি হয়ে বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিচরণ করেন। তাই বোধিসত্ত্ব হয়ে কতবার কোথায়, কখন, কিভাবে জন্মলাভ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো ঃ তিনি রাজা হয়ে ৮৫টি জাতকে, ঋষি ৮৩, বৃক্ষদেবতা ৪৩, আচার্য ২৬,

Dhaka University Institutional Repository

অমাত্য ২৪, ব্রাহ্মণ ২৪, রাজপুত্র ২৪, ভূম্যাধিকারী ২৩, পণ্ডিত ২২, ইন্দ্র ২০, বানর ১৮, শ্রেষ্ঠী ১৩, ধনী ১২, মৃগ ১১, সিংহ ১০, রাজহংস ৮, বর্ত্তক ৬, হস্তী ৬, কুক্কুট ৫, দাস ৫, গৃধ্র ৫, অশ্ব ৪, গো ৪, ব্রহ্মা ৪, ময়ূর ৪, সর্প ৪, কুম্ভকার ৩, নিচ জাতীয় লোক ৩, গাধা ৩, মৎস ২, গজচালক ২, মূষিক ২, শৃগাল ২, কাক ২, কাষ্ট-কুটটিক ২, চোর ২, শূকর ২ কুকুর ১, বিষবৈদ্য, ধূর্ত, কর্মকার, বর্ধকী এক বার করে। এভাবে ৫৩০টি জাতকের নাম পাওয়া যায়। [১৩] নিম্নে কিছু পশুপাখির বর্নণা তুলে ধরা হলোঃ

কুক্কুর জাতক

প্রাচীন ভারতবর্ষে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব পূর্বকর্মফলে কুক্কুর হয়ে জন্মলাভ করে বহু শত কুক্কুর পরিবৃত হয়ে মহাশ্মশানে বসবাস করতেন। বারাণসীরাজ হঠাৎ একদিন সিন্ধু দেশ যাওয়ার মনস্থ করলেন। শ্বেত ঘোটকযুক্ত ও সর্ববালংকারভূষিত রথে চড়ে উদ্যান ভ্রমণে গেলেন এবং সন্ধ্যার পর নগরে চলে আসলেন। রথের চর্ম্মা নির্মিত সজ্জা রাতে না খোলায় বৃষ্টিতে ভিজে গেল এবং রাজার কুক্কুরগুলো দোতলা থেকে নেমে এসে সমস্ত চামড়া খেয়ে ফেলল। ভৃত্যেরা না জেনেই রাজাকে পরদিন বলল নর্দমার মুখ দিয়ে কুক্কুর এসে রথের চামড়া খেয়ে ফেলেছে। রাজা রাগান্বিত হয়ে কুক্কুর দেখা মাত্রই মেরে ফেলতে বললেন। এতে নিরপরাধ কুক্কুর মারা গেল। যেখানে সেখানে কুক্কুর নিহত হতে লাগল। ভয়ানক কুক্কুর হত্যা দেখে হতাবশিষ্ট কুক্কুরেরা শ্মশানে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হলো এবং সমস্ত কিছু বোধিসত্ত্বের কাছে উপস্থাপন করলো। এতে বোধিসত্ত্ব খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন রাজপ্রাসাদের মধ্যে বাইরের কুক্কুর প্রবেশ করার কোন সুযোগ নেই। সেখানে যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আছে তারাই রথের চামড়াগুলো খেয়ে ফেলেছে। যাদের অপরাধ তাদের কোন ভয় নেই কিন্তু যারা নিরপরাধ তারা মারা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন রাজাকে প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত করতে হবে। বোধিসত্ত্ব জ্ঞাতি বন্ধুদের আশ্বাস দিয়ে বলল তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি রাজার কাছ থেকে না ফেরা পর্যন্ত তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা কর আমি তোমাদের প্রাণ রক্ষা করব। বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাব নিয়ে দানাদি দশপারমিতার নাম নিয়ে পথে রওনা হলেন। পথে তাকে কেউ আক্রমণ করেনি। বোধিসত্ত্ব রাজাসনের নিম্নে এসে উপস্থিত হলো এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্বক কুক্কুরদের হত্যা করার কথা জানালেন এবং রাজা বললেন হ্যাঁ আমি এই আদেশ দিয়েছি। তারা আমার রথের যাবতীয় সজ্জা চামড়া খেয়ে ফেলেছে। বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু আপনি কি জানেন কোন কুক্কুর চামড়া খেয়েছে ? রাজা বললেন না আমি জানি না।

বোধিসত্ত্ব বললেন আপনার প্রাসাদের কৌলেয় কুক্কুর আছে তারাই খেয়েছে। বোধিসত্ত্ব বললেন কৌলেয় কুক্কুরেরা নিরুদ্বেগে আছে, কিন্তু দুর্বল কুক্কুরেরা মারা যাচ্ছে। অতএব এতে সর্বকুক্কুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দণ্ড বলা যায় না, ইহা দুর্বল কুক্কুর ধ্বংস ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। তিনি আরো বললেন মহারাজ এটি আপনার অন্যায় আদেশ, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। এ কথা শুনে রাজা বললেন বোধিসত্ত্ব আপনি কি জানেন কোন কুক্কুর রথের চামড়া খেয়েছে? জানি মহারাজ। আমি প্রমাণ দেখাতে পারি। মহারাজ বললেন দিন দেখি। আপনি একটু ঘোল এবং কিছু পরিমাণ কুশ আনতে বলুন। রাজা ঘোল আর কুশ আনার জন্য আদেশ দিলেন। পরবর্তীতে বোধিসত্ত্ব কুশ এবং ঘোল একসাথে মিশিয়ে কুক্কুরগুলোকে খাওয়াতে বললেন। রাজা সেটাই করলেন। খাওয়ার পর কুক্কুরেরা চামড়া খণ্ডসহ বমি করে ফেলল। এতে রাজা অবাক হয়ে গেলেন এবং শ্বেতচ্ছত্র উপহার দিয়ে বোধিসত্ত্বের পূজা করলেন। বোধিসত্ত্ব "ধর্ম্মং" চর মহারাজ মাতা পিতৃষু ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি দশটি গাথা পাঠ করলেন এবং রাজাকে ধর্মোপদেশ দিয়ে তাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন এবং বললেন অপ্রমত্ত হয়ে চলার জন্য। মহারাজা বোধিসত্ত্বের সমস্ত ধর্মকথা শুনলেন এবং সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বাদিসহ সমস্ত কুক্কুরের জন্য প্রতিদিন রাজভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্মের মাধ্যমে জীবনযাপনপূর্বক দেহান্তে দেবলোকে পুনর্জন্ম লাভ করলেন। কুক্কুররূপী বোধিসত্ত্বের উপদেশ দশ সহস্র বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বোধিসত্ত্বও পরিণত বয়সে কুক্কুরলীলাসংবরণপূর্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করে লোকান্তরে প্রস্থান করলেন। [১৪]

তিত্তির জাতক (১)

প্রাচীনকালে হিমালয়ের সন্নিকটে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের কাছে তিত্তির, মর্কট এবং হাতী এ তিন বন্ধু একসাথে বসবাস করতো। কিন্তু তিন জন বন্ধু একে অপরের প্রতি কেউ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো না। হঠাৎ একদিন মনে হলো এভাবে চলাফেরা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, এটা অন্যায়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কে বয়োবৃদ্ধ জানার চেষ্টা করলো এবং কিভাবে নির্ণয় করতে হবে তার উপায় খুঁজে বের করলো। একদিন ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের নিচে বসা অবস্থায় তিত্তির এবং কর্কট হাতীকে জিজ্ঞাসা করলো ভাই হাতী যখন আপনি এই বৃক্ষ প্রথম দেখেছেন তখন এটি কত বড় ছিল? উত্তরে হাতী বললেন তখন

Dhaka University Institutional Repository

এই গাছ এতটাই ছোট ছিল যে আমি যখন এর উপর দিয়ে চলে যেতাম তখন পেটের নীচে গাছের অগ্রশাখা আমার নাভীতে স্পর্শ করতো । পরবর্তীতে বর্ত্তক ও হাতী মর্কটকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো সে বলল আমি ছোট বেলা থেকে মাটিতে বসে গলা বাড়িয়ে আগডালের কচি পাতা খেয়েছি বলে মনে হয়। পরিশেষে কর্কট ও হাতী তিত্তিরকে একই প্রশ্ন করলে তিত্তির বলে এ স্থানে একটা বড় ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ ছিল এবং সে বৃক্ষের ফল খেয়েছি এবং সে স্থানে মলত্যাগ করেছি। এখন এটিই সে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ। তাহলে অনুমান করা যায় জন্মের পর থেকেই এ বৃক্ষ দেখে আসছে। তাহলে তিত্তির এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োঃবৃদ্ধ তখন থেকে মর্কট এবং হাতী বয়োবৃদ্ধ তিত্তিরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করে দিল। দুই বন্ধু তিত্তিরকে বলল আমরা আপনার উপদেশ গ্রহণ করে চলব। আপনি আমাদের সদুপদেশ দিন। তিত্তিরকে শীলব্রত শিক্ষা দিল। নিজেও শীলব্রত প্রতিপালন করতে লাগল। এভাবে পঞ্চশীল নিয়ে সেই প্রাণিত্রয় পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা রক্ষা করে যথোচিতভাবে জীবনযাপন করে দেহান্তে দেবলোকবাসের উপযুক্ত হলো। এ তিন প্রাণীর মধ্যে তিত্তির ব্রহ্মচর্য্য নামে খ্যাতি লাভ করলো। এরা যদি লঘু গুরু মান্যগণ্য করে চলতে পারে তাহলে তোমরা ধর্ম ও বিনয় শিক্ষা করে কেন একে অপরের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেনা? আমার আদেশ অনুযায়ী বয়োবৃদ্ধ (বয়স্ক) দেখা মাত্রই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে নমস্কার করবে। বয়োবৃদ্ধরা সব সময় অগ্রগণ্য হবে। [১৫]

নিগ্রোধমৃগ জাতক

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব মৃগকুলে (হরিণ জন্ম) জন্মলাভ করেন। তাঁর দেহ ছিল হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় মণিগোলকবৎ ন্যায় উজ্জ্বল । জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তাঁর পুচ্ছ ছিল চমরী পুচ্ছের মতো, শরীর হয়েছিল অশ্বশাবকের ন্যায়। বোধিসত্ত্ব ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ নাম গ্রহণ করায় পঞ্চশত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করতেন। এছাড়া কিছু দূরে হেমবর্ণ আর একটি মৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল। তার নাম ছিল শাখামৃগ। রাজা ছিলেন মৃগয়াসক্ত। মৃগমাংস না হলে কোন সময় তার খাওয়া-দাওয়া চলতো না। রাজা প্রত্যহ প্রজা সাথে নিয়ে মৃগয়া করতে যেতেন। কিন্তু তার প্রজারা প্রতিদিন নিজ সংসারকার্যে অসুবিধা হওয়ায় তারা রাজার নিজ উদ্যানে মৃগদের আহারের জন্য তৃণ রোপন এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করে অরণ্য হতে মৃগ এনে উদ্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত। সব ঠিক করে প্রজারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একসাথে মৃগান্বেষণে বের হতো। তারা বনে প্রবেশ করার এক যোজন পর ন্যাগ্রোধমৃগ এবং শাখামৃগ উভয়েই বিচরণক্ষেত্র ঐ চক্রের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে পড়ল। বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখা মাত্রই তাদেরকে আঘাত করতে শুরু করলো এবং ভীত হয়ে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। এভাবে বহু মৃগ একসাথে হলো। পরদিন মহারাজা বাস্তবই উদ্যানে গেলেন এবং দেখলেন শত শত মৃগ আছে। তম্মধ্যে ব্রহ্মদত্ত দুটি হেমবর্ণ মৃগ দেখে বললেন আমি তোমাদেরকে মারবো না। এভাবে রাজা একটির পর একটি মৃগ বধ করতে লাগল এবং অন্যান্য মৃগরা ধনুকের শব্দে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। বোধিসত্ত্ব একদিন শাখামৃগের সাথে পরামর্শ করলো দু দল থেকে পর্যায়ক্রমে একটি মৃগ স্ব স্ব বারানুসারে ধর্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা স্থাপন করে এবং রাজপাচক সেখানে গিয়ে মৃগ শিরচ্ছেদ করবে। তাহলে অন্যান্যরা কেউই আহত কিংবা উদ্বিগ্ন হবে না। এভাবে একদিন শাখামৃগের দলের এক গর্ভিনী হরিণীর শিরচ্ছেদের দিন আসল। সে শাখামৃগকে বলল আমি অন্তঃসত্ত্বা। আমাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু শাখামৃগ রাজী হলেন না তোমার অদৃষ্টফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তখন হরিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন তাকে সমস্ত কথা বললেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন আমি তোমার প্রাণরক্ষা করব। বোধিসত্ত্ব নিজেই বধক্ষেত্রে গিয়ে গণ্ডিকার উপর মস্তক দিয়ে শুয়ে থাকলেন। যথাসময়ে রাজপাচক আসলেন সে বোধিসত্ত্বকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পাচক রাজাকে যেয়ে বললেন। রাজা শোনার সাথে সাথে রথ আরোহণে এসে হাজির হলেন। বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করে বললেন আমি তোমাকে তো অভয় দিয়েছি তুমি কেন গণ্ডিকার উপর মাথা রেখেছো? বোধিসত্ত্ব তখন মহারাজাকে বললেন সেই অন্তঃসত্ত্বা হরিণীর কথা। সে আমার কাছে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করলো। তখন ভাবলাম একের প্রাণ রক্ষার্থে অন্যের বিনাশ করতে পারি না। কাজেই ভাবলাম নিজের জীবন দিয়ে অন্যের জীবন বাচাঁব। তার জন্য আমি মরব। এখানে আর কোন কথা থাকতে পারে না মহারাজ। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন মৃগরাজ আজ আপনি যে মৈত্রী প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন সেটি কোন মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায় না। আপনি উঠে আসুন। আমি আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম। আপনাদের কারোর প্রাণ বিনাশ হবে না।

এভাবে রাজার কাছ থেকে সমস্ত প্রাণীর জীবন ফিরে পেয়ে বোধিসত্ত্ব ধর্মগণ্ডিকা হতে মস্তক উত্তোলন করে রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দেয় এবং বলে মহারাজ ধর্মপথে চলুন, মাতাপিতাকে,পুত্রকন্যাকে, গৃহী সন্ন্যাসীকে, পৌর জনপদ, সকলের সাথে ধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করুন। তাহলে আপনি যখন দেহত্যাগ করবেন তখন দেবলোক গমন করতে পারবেন। এভাবে বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্যের সাথে রাজাকে ধর্মোপদেশ দিয়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরসহ অরণ্যে চলে গেলেন। পরবর্তীতে রাজার কাছ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

অভয় পেয়ে মৃগেরা মানুষের ফসল অনিষ্ট করতে শুরু করলো। কিন্তু রাজার ভয়ে তাদেরকে কেউ মারতো না। এজন্য সবাই রাজার কাছে গেল। রাজা বললেন আমি ন্যাগোধমৃগকে কথা দিয়েছি আমার রাজ্যের মধ্যে কেউ মৃগদেরকে অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু এ কথা বোধিসত্ত্বের কানে পৌঁছে যাওয়ার সাথে তাঁর অনুচরদেরকে ডেকে বললেন আজ থেকে তোমরা মানুষের শস্য খাবে না। অতঃপর তিনি লোকালয়ে সংবাদ পাঠালেন কৃষকগণ আজ থেকে কোন মৃগ তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে অনিষ্ট করবে না। পরবর্তীতে কোন মৃগ কখনও শস্যের আশেপাশে যেত না এবং তাদের কোন শস্য আর নষ্ট হতো না। এভাবে বোধিসত্ত্ব অনুচরদেরকে সদাচার শিক্ষা দিয়ে পরিশেষে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করে লোকান্তরে প্রস্থান করলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করে বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীর্ঘজীবন যাপনপূর্বক কর্ম্মানুরূপগতি প্রাপ্ত হলেন। [১৬]

শকুন জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব পক্ষিজন্ম হয়ে বহুসংখ্যক পক্ষি পরিবৃত হয়ে অরণ্য মধ্যস্থ শাখা প্রশাখা বেষ্টিত এক মহাবৃক্ষে বাস করতেন। ঐ বৃক্ষের সব পক্ষি বুদ্ধিতে একরকম ছিল না। কিছু পক্ষির বুদ্ধি ছিল আর কিছু পক্ষি ছিল নির্বোধ। একদিন বোধিসত্ত্ব দেখলেন ঐ বৃক্ষের শাখার সহিত অন্য শাখার ঘর্ষণের ফলে ধোঁয়া উঠতে লাগল। এই দেখে বোধিসত্ত্ব খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এভাবে অনেকক্ষণ ঘর্ষণ হতে থাকলে আগুনের উৎপত্তি ঘটবে। তাহলে এই বৃক্ষে আর অবস্থান করা ঠিক হবে না। বোধিসত্ত্ব এখান থেকে খুবই দ্রুত অন্যত্র আশ্রয় নিতে বললেন। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান পক্ষি তারা সেস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল। আর যারা নির্বোধ তারা বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত না করে সেই বৃক্ষেই থেকে গেল। নির্বোধ পক্ষিরা বলল "উহার স্বভাবই এই রকম বিন্দুমাত্র জলেও কুম্ভীর দেখে"। বোধিসত্ত্ব যেটি ধারণা করেছিলেন যে অচিরেই এই বৃক্ষে আগুন প্রজ্জলিত হবে এই বৃক্ষটি দগ্ধ হবে। যখন অগ্নিশিখা নির্গত হলো তখন নির্বোধ পক্ষিরা আর পলায়ন করতে পারলো না আগুনে পুড়ে মারা গেল। [১৭]

কৃষ্ণ জাতক

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব গো-যোনিতে জন্ম লাভ করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বোধিসত্ত্বের শরীর কাজলের মতো অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হতে লাগল। তিনি শীলব্রত পালন করতেন এবং গ্রামেই বাস করতেন। গ্রামের ছোট ছেলেরা কৃষ্ণের শিং ধরে, কান ধরে, গলা ধরে

Dhaka University Institutional Repository

খেলত। আবার কেউ কেউ পিঠে চড়ত। বোধিসত্ত্ব একদিন মাঠে অন্যান্য গরুর সাথে কাজ করছিলেন। হঠাৎ করে সার্থবাহ পুত্র পাঁচশ গাড়ী নিয়ে নদীর ধারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পথের তলদেশ এমন বন্ধুর ছিল যে গাড়ী কিছুতেই অন্য পারে যেতে পারছিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বণিকের পাঁচশত গাড়ী এক এক করে পার করে দিলেন। বণিক খুশী হয়ে বোধিসত্ত্বকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিলেন। সেই মুদ্রা নিয়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত হলে মা খুবই খুশী হলো এবং সে বোধিসত্ত্বকে স্নান করে উৎকৃষ্ট খাবার খাওয়ালো। এখানে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো বণিকের সহস্র গরু থাকা সত্ত্বেও গাড়ী পার করতে পারলো না কিন্তু বোধিসত্ত্ব একাই পাঁচশত গাড়ী পার করে দিলেন। পরবর্তীতে বোধিসত্ত্ব এবং তাঁর বৃদ্ধা মাতা নিজেদের কর্মফলে লোকান্তরে প্রস্থান করলেন। [১৮]

লক্ষণ জাতক

প্রাচীনকালে মগধের রাজার সময়কালে বোধিসত্ত্ব মৃগকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের দু'জন পুত্র হলো। বড় পুত্রের নাম লক্ষণ এবং ছোট পুত্রের নাম কালু। বোধিসত্ত্ব বৃদ্ধ হওয়ার পর প্রত্যেক পুত্রকে পঞ্চশত মৃগের দেখাশোনার ভার দিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের দু'ই পুত্র ছিলেন দুই ধরণের। বড়টা ছিল বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ছোটটা ছিল নির্বোধ। ফসল উঠার সময় মৃগরা ফসল খেয়ে ফেলতো এজন্য তাদের মারার জন্য ফসলের মালিকেরা কোথাও গর্ত খুড়ত, কোথাও শূল পুতত, কোথাও জাল পেতে রাখতো অর্থাৎ যেকোন উপায়ে তাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতো। বোধিসত্ত্ব তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে বললেন ফসলের সময়কালে অনেক মৃগ মারা যায় কাজেই বহুদর্শিতার গুণে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাই বোধিসত্ত্ব বললেন তোমাদের অভিজ্ঞতা নেই, তোমরা আপন আপন অনুচর নিয়ে পাহাড়ে যাও। যখন মাঠের ফসল উঠে যাবে তখন আবার অনুচরদের নিয়ে ফিরে এসো। তারা দুই ভাই অনুচরগণ সহ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করলো। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার কারণে কালুর অনেক মৃগ মারা গেল। লক্ষণ ছিল বুদ্ধিমান। সে লোকালয়ে চলার উপায় কুশল জানত। লক্ষণ লোকালয়ে নিশীথ সময়ে আসা যাওয়া করতো । এজন্য লক্ষণের একটি মৃগও মারা গেল না। সে তার পঞ্চশত মৃগ নিয়ে পাহাড়ে যেয়ে উপস্থিত হলো। বোধিসত্ত্বের দু'ই পুত্র পাহাড়ে চার মাস অতিবাহিত করলো এবং ফসল উঠার পর ফিরে আসল। লক্ষণ তাঁর পঞ্চশত অনুচর নিয়ে ফিরল এবং কালু নির্বুদ্ধিতার কারণে অনুচরেরা নিহত হলো এবং একাকী ফিরে আসল। লক্ষণের একটা অনুচরও মরলো না পাঁচশই বেঁচে

Dhaka University Institutional Repository

থাকল। বোধিসত্ত্ব লক্ষণকে অভিনন্দন করলেন তার বুদ্ধির জন্য। লক্ষণ তার বুদ্ধির জন্য ও কর্মফলের জন্য পরিণত বয়সে লোকান্তরে গমন করলেন। [১৯]

কপোত জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব পারাবতরূপে জন্মলাভ করেন এবং ঘরে ঝুড়ির মধ্যে জীবনধারণ করতেন। তখনকার সময়ে বারাণসীর পাখীদের বসবাসের উপযোগী ও আশ্রয়ের স্থান হিসেবে খড় দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করে রাখত। এমনিভাবে রাজার পাচকও রন্ধনশালায় একটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়িতে দিন-রাত্রি যাপন করতেন। হঠাৎ একদিন একটি লোভী কাক রন্ধনশালার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় মাছ-মাংসের গন্ধ পেয়ে খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল। কিভাবে রন্ধনশালায় প্রবেশ করবে। উপায় কৌশল অবলম্বন করে লোভী কাক পাহারায় থাকতে থাকতে বোধিসত্ত্বকে রন্ধনশালায় প্রবেশ করতে দেখে তখন তার মনে হলো এ পারবতের মাধ্যমে সে রান্নাঘরে প্রবেশ করতে পারবে।

পরদিন সকালে বোধিসত্ত্ব বের হওয়ার সাথে সাথে তাঁর পেছনে কাক চলতে থাকলে তখন বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কেন আমার সাথে চলছো ? কাক উত্তরে বলল আপনার চলাচল আমার খুব ভাল লাগে। বোধিসত্ত্ব কাককে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা বলল কিন্তু তাতেও কাকের কোন সমস্যা নেই। সন্ধ্যা হলে বোধিসত্ত্বের ঘরে ফেরার সময় হয়ে যায়। প্রতিদিনের মতো বোধিসত্ত্ব ঘরে ফিরে আসলেন কাকও সাথে সাথে রন্ধনশালায় প্রবেশ করলো। রাজ পাচক মনে করলো কপোতের সাথে যখন আরেকটি পাখী এসেছে তাহলে তার জন্য আরেকটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিই। পরবর্তীতে দুই পাখী একসাথে বসবাস করতে শুরু করলো। হঠাৎ একদিন পাচক শ্রেষ্ঠীর রান্নাঘরে প্রচুর মাছ ও মাংস আনল রান্নার জন্য। এগুলো দেখে কাক চিন্তা করলো আগামীকাল খাদ্য সংগ্রহে যাবো না এজন্য সারা রাত অসুস্থতার ভান করলো। সকালে কাক বোধিসত্ত্বকে বলল আমি আজ বাইরে যাবো না আমার কুক্ষিতে ভীষণ ব্যাথা। বোধিসত্ত্ব কাককে বললেন কাকের কখনো কুক্ষিরোগ হয় এটা আমি কখনো শুনি নাই।

বোধিসত্ত্ব বুঝতে পেরে কাককে বলল লোভের বশীভূত হয়ো না। মানুষের খাদ্য তোমার জন্য দুষ্পাচ্য। এটা বলে বোধিসত্ত্ব বাইরে চলে গেলেন। কাক মাছ-মাংসের গন্ধ পেয়ে রান্নাঘরে ছুটে গেল

Dhaka University Institutional Repository

এবং সে ভাবল এখন মাংস খেয়ে আমার মনোবাসনা পূরণ করতে পারব। পাচক রান্না শেষ করে গরম মাছ মাংসের পাত্রের উপর ঝাঁঝারি দিয়ে রাখল বাষ্প নির্গমন করার জন্য। তৎক্ষণাৎ কাক উড়ে গিয়ে ঝাঁঝারির উপর বসল এবং পাচক ঐ শব্দে রান্নাঘরে এসে কাককে দেখতে পেয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার সমস্ত শরীর থেকে পালক তুলে ফেলে আদার সাথে লবণ এবং সমস্ত মসলার সাথে টক ঘোলের সাথে মিশিয়ে তার গায়ে দিয়ে ঝুড়ির ভেতর ফেলে রাখলো এবং সে যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে কাকের দুরবস্থা দেখে বললেন আমার কথা না শুনে তোমার এ অবস্থা। বোধিসত্ত্ব আগেই তাকে সতর্ক করেছিলেন লোভে বশীভূত হয়ো না। বোধিসত্ত্ব সেখান থেকে অন্যস্থানে চলে গেলেন এবং কাক সেখানেই মৃত্যুবরণ করলো এবং খড়ের ঝুড়িসহ তাকে আবর্জনার উপর ফেলে দিল । বোধিসত্ত্ব লোভী কাকের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ গাথাটি বললেন-

হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
স্বেচ্ছাচারী যেইনা করে শ্রবণ
বিপত্তি তাহার, জেনো দুর্নিবার
এই দেখ কাক প্রমাণ তাহার।[২০]

এই গাথা বলে বোধিসত্ত্ব নিজেও সেখান থেকে চলে গেলেন।

মশক জাতক

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করতেন। তিনি বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ গমন করতেন। তখনকার সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু সূত্রধর বাস করতো । কাশীরাজ্যের পলিতকেশ সূত্রধর কাঠ চেরাই করার সময় একটা মশা তার মাথার উপর উপবেশন করে শল্যসদৃশ তুণ্ড বিদ্ধ করে দিল। সূত্রধর তার পুত্রকে বলল বাবা আমার মাথায় মশা শল্যসম হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে তুমি মশাটা তাড়িয়ে দাও। ঠিক ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব সূত্রধরের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। নির্বোধ পুত্র মশা তাড়াতে গিয়ে তীক্ষ্ণ ধারালো কুঠার দিয়ে পিতার পৃষ্ঠদিকে অবস্থান করা মশাকে মারতে গিয়ে এক আঘাতে বাবার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করলো। তৎক্ষণাৎ পিতার মৃত্যু ঘটল। বোধিসত্ত্ব নিজের চোখে সবকিছু অবলোকন করলেন। তিনি চিন্তা করলেন এরূপ নির্বোধ বন্ধু অপেক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত শত্রু অনেক ভাল কারণ যার জন্য মৃত্যুর কোন আশংকা থাকে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সে অন্তত পক্ষে দণ্ডভয়েও নরহত্যা থেকে বিরত থাকে। [২১]

বানরেন্দ্র জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব বানররুপে জন্মলাভ করেছিলেন। জন্মের পর বোধিসত্ত্ব নদীর তীরে বসবাস করতেন। ঐ নদীর মধ্যে আম্রপনস ফলবৃক্ষ সম্পন্ন এক দ্বীপ ছিল। বোধিসত্ত্ব নদীর যে তীরে থাকতেন সেখান থেকে দ্বীপ পর্যন্ত অর্দ্ধপথে নদী গর্ভে একটি শৈল অবস্থিত ছিল। তিনি প্রতিদিন নদীর এই তীর থেকে এক লাফ দিয়ে শৈলের উপর এবং আরেক লাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। তিনি দ্বীপে নানা প্রকার ফল আহার করে আর ঐভাবে নদী পার হয়ে বাসস্থানে ফিরে আসতেন। একই নদীতে কুম্ভীর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করতেন। হঠাৎ কুম্ভীরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর মনে হলো সে বানরের হৃদপিণ্ড খাবে। সে কুম্ভীরকে বলল। কুম্ভীর বলল ঠিক আছে তোমার কথামতো তাই হবে। আজ সন্ধ্যায় যখন বানর ফিরে আসবে তখন শৈলোপরি উঠে থাকব তাহলে তাঁকে ধরতে পারব। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীর জল কতদুর উঠত, কতদুর নামত, পাহাড় কতদুর জাগত সেগুলো মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতো । কিন্তু বুদ্ধিমান বানর সন্ধাকালে শৈলের দৃষ্টিপাত করে দেখলেন নদীর পানি কমেওনি আবার বাড়েওনি কিন্তু পাষাণের অগ্রভাগ উচ্চতর মনে হলো। বোধিসত্ত্বের সন্দেহই সঠিক তাঁকে ধরিবার জন্য কুম্ভীর বসে আছে। বোধিসত্ত্ব ওহে পাষাণ বলে উচ্চস্বরে চীৎকার করলেন কিন্তু উত্তর না পেয়ে কৌশলে কুম্ভীর উত্তর দিল। বোধিসত্ত্ব বলল তুমি কে? আমি কুম্ভীর। তোমাকে ধরব এবং তোমার কলিজা খাব। বুদ্ধিমান বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন দ্বীপ হতে ফেরার আর অন্য কোন পথ নেই। এজন্য কুম্ভীরের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে ওর কথা শুনতে হবে। তিনি বললেন কুম্ভীর ভাই তুমি হাঁ কর আমি লাফিয়ে পড়ব তুমি তখন আমাকে ধরে ফেলবা। কুম্ভীররা যখন মুখটা হাঁ করে তখন তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। বোধিসত্ত্ব যে কুম্ভীরের সাথে চালাকি করছে এটা সে বুঝতে পারেনি। কুম্ভীর হাঁ করলো বোধিসত্ত্ব তার মাথার উপর উঠে অপর এক লাফে দ্রুতবেগে নদীর তীরে অর্থাৎ তার বাসস্থানে এসে উপস্থিত হলো। বানরের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়ে কুম্ভীর বলল চারটি গুণ থাকলে সব শত্রু দমন করা যায়। সেই চারটি গুণই বানরেন্দ্রর মধ্যে বিরাজমান।

সত, ধৃতি, ত্যাগ, বিচারক্ষমতা এই চারিগুণে সবে
বিষম সংকটে পায় পরিত্রান, রিপুগণ পরাভবে। [২২]

Dhaka University Institutional Repository

শীলবন্নাগ জাতক

প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব হস্তিরূপ ধারণ করে জন্মলাভ করেছিলেন। জন্মের পর থেকেই তাঁর দেহ দানশীলাদি দশপারমিতাযুক্ত হয়ে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এবং সেটা অনুসরণের মাধ্যমেই জীবন পরিচালনা করে আসছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হিমদেশের সমস্ত হস্তীর অধিনায়ক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে ষষ্টি সহস্র হস্তীর আধিপত্য লাভ করেও দলের অন্যান্য হস্তীরা পাপ কর্মে লিপ্ত হলেন এজন্য দল থেকে বিদায় নিয়ে একাকী অরণ্যে বসবাস করতে শুরু করলেন। বোধিসত্ত্ব সৎ চরিত্রগুণে শীলবান গজরাজ নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হঠাৎ একদিন বারাণসীর এক ব্যক্তি নিজের খাবার সংগ্রহের জন্য হিমালয়ের অরণ্যে এসে পথ হারিয়ে প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক বিলাপ করতে লাগল। তার বিলাপধ্বনি বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হয়ে তিনি তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বোধিসত্ত্বকে দেখে সে প্রথমে ভয় পেয়ে পলায়ন করছিল। বোধিসত্ত্ব লোকটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে শুরু করলে সেখান থেকে সে অন্যত্র চলে যায় বোধিসত্ত্ব থামলে আবার সে থেমে যায় তখন লোকটির বোধ উদয় হলো সে আমাকে উপকার করবে তাঁর দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবে না। বোধিসত্ত্ব লোকটিকে নিজ বাসস্থানে নিয়ে গেলেন এবং নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তাকে আহার করালেন এবং বেশ কিছুদিন কাছে রাখলেন। কিছুদিন পর বোধিসত্ত্ব নিজ পীঠে চড়ে লোকটির বাসস্থানে পৌঁছিয়ে দিলেন। অন্য একদিন সেই বারাণসীবাসী জীবিকা নির্বাহের জন্য দন্তকার বীথিতে প্রবেশ করে দেখলেন বিভিন্ন পশুপাখি এবং গজদন্ত দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের জিনিষপত্র তৈরি করে বিক্রয় করে। তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্বের কথা মনে পড়ল এবং লোকটি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কি জীবিত হস্তীর দন্ত ক্রয় কর ? দন্তকারেরা বলল মৃত হস্তীর দন্ত অপেক্ষা জীবিত হস্তীর দন্তের মূল্য অনেক বেশী। লোকটি ছিল অকৃতজ্ঞ। বোধিসত্ত্ব তাকে কাছে রাখল ভালো খাবার খাওয়ালো আবার নিজ বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসল কিন্তু তারমধ্যে কোন কৃতজ্ঞতা ছিল না। ঠিকই বোধিসত্ত্বের দন্ত কাটার জন্য একটি সুতীক্ষ্ণ ধারালো করাত সাথে নিয়ে আসল। বোধিসত্ত্ব তাঁর দন্ত কেটে দিতে প্রস্তুত। বোধিসত্ত্ব লোকটির জীবিকা নির্বাহের জন্য সত্যিই সে নিজ দন্তের অগ্রভাগ কেটে তার হস্তে দান করলেন। এভাবে লোকটি আরও দুইদিন আসলেন দন্তের শেষ দুইভাগ নেওয়ার জন্য বোধিসত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাকী অংশটুকু দিলেন এবং বললেন দেখ তুমি মনে করো না আমার দাঁত দুটির উপর কোন মায়া মমতা নেই। এই দাঁত সবর্বধর্ম্মপ্রতিবেদন সমর্থ সর্ব্বজ্ঞতারূপ এবং শত সহস্র গুণ প্রিয়তর। পরিশেষে বোধিসত্ত্বের নিকট থেকে দন্ত নিয়ে অতিক্রম করতে না করতেই সুমেরুযুগন্ধরাদি পর্বতের ন্যায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত মূলমূত্রাদির মহাভারবহনসমর্থা বিপুলা অর্থাৎ পৃথিবীও যেন তাঁর পাপবহনে অসমর্থ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই বিদীর্ন স্থান থেকে খুব জ্বালা নির্গত হলো এবং নিজের ব্যবহার্য কম্বলের মতো পাপাত্মাকে পরিবেষ্টনপূর্বক রসাতলে নিয়ে গেল। ভূগর্ভে প্রবেশ করে বনবাসিনী বৃক্ষদেবতা চুতুর্দ্দিক নিনাদিত করে বললেন অকৃতজ্ঞ এবং মিত্রদ্রোহী ব্যক্তিকে রাজচক্রবর্তীর পদ দান করলেও তার আত্মতৃপ্তি হয় না। পরবর্তীতে বোধিসত্ত্ব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সুখে শান্তিতে থেকে যথাসময়ে লোকান্তরে গমন করেন। [২৩]

মৎস জাতক (২)

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোশরাজ্যের শ্রাবস্তী নগরের সরোবরে মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের পর সেই লতাবিতান বিস্তৃত সরোবরেই বসবাস করতেন। হঠাৎ অনাবৃষ্টির কারণবশত মহামারি খরা হওয়ায় সরোবরটি জলহীন হয়ে পড়লে মৎস্য এবং কচ্ছপ পঙ্কের ভিতর আশ্রয় নিলেও কাক এবং অন্যান্য পক্ষিগণেরা তাদের উপর অত্যাচার শুরু করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব জ্ঞাতিবন্ধুদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করার জন্য চিন্তা করলেন আমি ছাড়া এদেরকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না । তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন ধর্মসাক্ষী রেখে বারিবর্ষণ করে এদের দুঃখ হতে মুক্তি দিতে হবে। এই চিন্তা করে কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম ভেদ করে এবং তাঁর বিশাল দেহ হতে কজ্জললিপ্ত চন্দনকাঠনির্মিত পেটিকাবৎ প্রতিয়মান হতে লাগল। বোধিসত্ত্ব চক্ষুদ্বয় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে পর্জ্জন্যদের উদ্দেশ্য বলতে লাগল হে পর্জ্জন্য আমার জ্ঞাতি বন্ধুদের বড় দুর্দশা আমি অনেক কষ্টে আছি। আমি শীলবান কিন্তু আমি তাদের জন্য অনেক কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তুমি কেন বারিবর্ষণ করছো না এটা আমার কাছে খুবই অবাক লাগছে। বোধিসত্ত্ব আকুল হয়ে বলতে লাগলেন আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছি তারা একে অপরের মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু আমি কখনো মাংস ভক্ষণ করিনি এবং প্রাণি হত্যাও করিনি। বোধিসত্ত্ব বললেন এই কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি এখনই বারিবর্ষণ করবে। প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে সেইরূপ বোধিসত্ত্বও দেবরাজ পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন। আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচুর বারিবর্ষণ হলো এবং বহুপ্রাণীকুলেরা মরণভয় হতে পরিত্রাণ পেল। যথাসময়ে বোধিসত্ত্বের জীবনের অবসান ঘটল এবং কর্মফলের জন্য লোকান্তরে গমন করলেন। [২৪]

শৃগাল জাতক (১)

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব শ্মশানবনে বৃক্ষদেবতারূপে বসবাস করতেন। হঠাৎ একদিন রাজপ্রসাদ থেকে ঘোষণা করলো বারাণসীতে উৎসব উদযাপন করা হবে এটা জেনে নগরবাসীরা যক্ষদেরকে পূজা দেবে বলে চিন্তা করলো এবং রাজপথে মাংস এবং সুরাপূর্ণ ভাণ্ড রেখে দিল। ঠিক সেইদিন রাতেই একটি শৃগাল নর্দ্দামা দিয়ে নগরে প্রবেশ করলো এবং ঐ মাংস এবং সুরা খেয়ে ফেলল এবং একটি গুল্মের ভিতর রাত্রিযাপন করলো। কিন্তু রৌদ্র উঠায় মানুষের ভয়ে সে আর বের হতে পারল না। পথে এক জায়গাতে লুকিয়ে ছিল।এই শৃগাল ছিল খুবই বুদ্ধিমান। রাজপথ থেকে অনেক মানুষ যাতায়াত করলেও তাদের মধ্যে থেকে একজন ব্রাহ্মণকে লোভ দেখিয়ে শৃগাল বলল ওহে ব্রাহ্মণ আমার দুইশত কাহণ ধন আছে আমাকে যদি এখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন তাহলে আমার সমস্ত ধন তোমাকে দিব। ব্রাহ্মণ ধনলোভে তাকে নগর থেকে বের করলো। এভাবে বহুদুর অগ্রসর হতে লাগল একসময় ব্রাহ্মণকে নিয়ে সে শ্মশানে উপস্থিত হলো এবং সেখানে শৃগালকে নামিয়ে দিল এবং ব্রাহ্মণকে বলল আপনার ভূমির উপর উত্তরীয় ঘানি বিস্তৃত করুন এবং বৃক্ষমূল খনন করুন। ব্রাহ্মণ ধনলোভে প্রবৃত হয়ে ভূমিখননে প্রস্তুত হলেন। শৃগাল উত্তরীয় বৃক্ষের উপর উঠে তার চতুস্কোণেও মধ্যভাগে মলমূত্র ত্যাগ করে শ্মশানে চলে গেল। বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বললেন তুমি এ স্থান ত্যাগ কর এবং উত্তরীয় ধুয়ে স্নান করে তোমার গৃহে গমন কর এবং নিজের কাজকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করো। ব্রাহ্মণকে একথা বলেও বোধিসত্ত্ব মর্মাহত হলেন। তিনি ভাবলেন আমি কি ব্রাহ্মণকে ঠকালাম। পরিশেষে বোধিসত্ত্ব নিজেও নিজ গৃহে গমন করলেন। [২৫]

অনুশাসক জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়স বৃদ্ধির পর বোধিসত্ত্ব সমস্ত পক্ষিদের রাজা হয়েছিলেন এবং হাজার হাজার পক্ষি একসাথে হয়ে হিমালয়ে বিচরণ করতো । সেই সময়ে এক লোভী পক্ষিণী খাদ্যের খোঁজে রাজপথে বিচরণ করতে শুরু করলো। রাজপথে শকট হতে প্রচুর পরিমাণে ধান, মুগ এসব খাদ্যদ্রব্য পড়ত পক্ষিণী সে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যগুলো আহার করতো । পক্ষিণী এতটাই লোভী ছিল যে অন্য পক্ষি যাতে না আসে সেজন্য অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষিদেরকে বলতে শুরু করলো রাজপথে নানা বিপদের আশংকা আছে সে পথ দিয়ে বিভিন্ন হাতী, ঘোড়া চলাচল করে তাই যখন তখন ওখান দিয়ে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এভাবে অন্যান্য পক্ষিদেরকে নিষেধ করে দিল। এজন্য অন্যান্য পক্ষিরা তার নাম দিল অনুশাসিকা। হঠাৎ খাদ্যান্বেষনের জন্য অনুশাসিকা রাজপথে গেল এবং দ্রুত খাদ্য আরোহণের সময় দ্রুত গতিবেগে তার শরীরের উপর দিয়ে শকট চক্র চলে গেল কিন্তু অনুশাসিকা উড়ে যেতে পারল না। তাঁর সমস্ত দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। অন্যান্য পক্ষিরা রাজপথ থেকে অনুশাসিকার দ্বিখণ্ডিত দেহ উদ্ধার করলো। সে লোভের বশীভূত হয়ে নিজ প্রাণ ত্যাগ করলো। বোধিসত্ত্ব বললেন অনুশাসিকা অন্যান্য পক্ষীদের নিষেধ করতো কিন্তু সেই প্রাণ হারালো। [২৬]

বর্ত্তক জাতক (২)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব বর্ত্তক যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে এক বর্ত্তক ব্যাধ বনে গিয়ে বর্ত্তক ধরত এবং নিজ গৃহে লালন পালন করতো এবং ক্রয় বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো । হঠাৎ বোধিসত্ত্ব একদিন বহু বর্ত্তকের মধ্যে ধরা পড়ে তার গৃহে গমন করলেন। বর্ত্তকদের লালন-পালন করার জন্য তাঁদেরকে পানীয় ও খাবার আহার করাতো। কিন্তু বোধিসত্ত্ব সেসব পানীয় ও খাবার গ্রহণ করতেন না। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করতে লাগল যে ঐ খাবার গ্রহণ না করলে আমি রোগা হয়ে যাব আর স্বাস্থ্য ভাল না হলে আমাকে কেউ ক্রয় করবে না যার ফলে আমি খাদ্য গ্রহণ করব না। বোধিসত্ত্বের চিন্তাটা কাজে লাগল হঠাৎ একদিন বোধিসত্ত্ব অসুস্থ্য হয়ে পড়ল কেউ তাকে ক্রয় করতে চাইল না। ব্যাধ চিন্তিত হয়ে খাঁচাটি বাইরে আনল এবং তাঁর কি অসুখ হয়েছে সেটা দেখার জন্য হাতে নিল এবং হঠাৎ এক সময় বধ অন্যমনস্ক হওয়ায় বোধিসত্ত্ব পাখা মেলিয়ে উড়ে গিয়ে নিজ জায়গায় প্রস্থান করলেন। বোধিসত্ত্বের প্রত্যাগমন করতে দেখে অন্য সকল বর্ত্তকেরা খুব খুশী হলো এবং সে এতদিন কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল, কিভাবে মুক্তি পেল তার বিস্তারিত সবকিছু অন্য সকল বর্ত্তকদেরকে বললো।[২৭]

দুর্মেধা জাতক (২)

প্রাচীনকালে মগধরাজ্যের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব হস্তিকুলে জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ছিল শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ খুবই রূপ সম্পন্ন সুলক্ষণযুক্ত দেখে মগধরাজ তাঁকে মঙ্গলহস্তীর পদে আসীন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। কোন এক সময়ে রাজগৃহের দেবনগরটি খুব সুন্দরভাবে সাজসজ্জা করা হয়েছিল এবং রাজা অলংকৃত সাজে মঙ্গলহস্তীতে চড়ে দেবনগর পরিদর্শন করলেন। কিন্তু সর্ব্বলংকার পরিশোভিত রাজাকে দেখে কেউ মুগ্ধ হলেন না মঙ্গলহস্তীর রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে তাঁর গুনগান করতে শুরু করলো এতে করে রাজা খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং চিন্তা করলেন পর্বতের শিখর থেকে ফেলে মঙ্গলহস্তীকে মেরে ফেলবে। পরবর্তীতে রাজা গজাচার্য্যকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এই হস্তী কি শিক্ষিত? গজাচার্য্য বললেন হ্যাঁ মহারাজা সুশিক্ষিত। রাজা বললেন এই হস্তী সুশিক্ষিত না বরং দুঃশিক্ষিত। গজাচার্য্য আবারও বলল হ্যাঁ হুজুর এই হস্তী সুশিক্ষিত। রাজা বললেন যদি তাই হয় তাহলে একে পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করাতে পারবে? নিশ্চয় পারব হুজুর। রাজা নিজে হস্তীর পিঠে চড়ে পর্বতের পাদদেশে পর্যন্ত গেলেন তারপর গজাচার্য্য হস্তীর পিঠে চড়ে পর্বতের শিখরে আরোহণ করলো। পরবর্তী রাজার আদেশে মঙ্গলহস্তীকে প্রপাতাভিমুখে দাঁড় করিয়ে প্রথমে তিন পায়ে ভর দিয়ে দাড়াঁতে বলল মঙ্গলহস্তী গজাচার্য্যর আদেশে সেইভাবেই দাঁড়াল। দ্বিতীয়বার আবার সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাড়াঁতে বলল। তৃতীয়বার আবার পশ্চাতের দুই পা তুলে সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর করে দাড়াঁও। অতঃপর আবার আদেশ হলো একপায়ে ভর করে দাড়াঁও। গজবর তিন পা তুলে এক পায়ে দাঁড়াল। কিন্তু মঙ্গলহস্তী কোন ভাবেই পড়ল না। রাজা তখন গজাচার্য্যকে বললেন মঙ্গলহস্তীর এত ক্ষমতা তাহলে তাকে আকাশে উড়তে বল। রাজা আসলে পাপাচারী ছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলহস্তীকে পর্বত থেকে ফেলে দেওয়া। গজাচার্য্যর কথা মতো তাকে পিঠে নিয়ে মঙ্গলহস্তী ব্যোমপথে বারাণসীতে চলে গেল। মঙ্গলহস্তীকে আকাশে দেখা মাত্রই রাজা আশ্চার্য হয়ে গেল এবং গজাচার্য্য বলতে লাগল মহারাজ এই হস্তী পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধিমান তোমার মতো নির্বোধ ও পাপাচার রাজার অযোগ্য। পূণ্যবান পণ্ডিত রাজার জন্য এই মঙ্গলহস্তীর প্রয়োজন। মঙ্গলহস্তীকে আকাশ পথে উত্থিত হতে দেখে সমস্ত বারাণসীবাসী আনন্দে আপলুত হয়ে উঠল এবং রাজাকে এই খবরটা জানাল। বোধিসত্ত্ব ভূতলে অবতরণ করলো। গজাচার্য্য রাজাকে বৃত্তান্ত বললেন এবং তিনি মনের আনন্দে মঙ্গলহস্তীর পদে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর রাজ্যের সবকিছু তিনভাগ করে একভাগ নিজের জন্য একভাগ গজাচার্য্যের জন্য এবং একভাগ বোধিসত্ত্বকে দান করলেন। পরবর্তী রাজার পূর্ণ্যকর্মের জন্য শেষ জীবন আনন্দের সাথে কাটালেন এবং বোধিসত্ত্ব সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হয়ে দানাদি পূর্ণকার্য্যের অনুষ্ঠান করলেন এবং শেষ জীবনে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হলেন।[২৮]

বিড়াল জাতক

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর সময়কালে বোধিসত্ত্ব মূষিকযোনিতে জন্মলাভ করেছিলেন। তিনি বহুশত মূষিকদের নিয়ে একসাথে বসবাস করতেন। মূষিক একদিকে ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান এবং আরেকদিকে ছিলেন শূকর-শাবকের মতো বৃহদাকার। একদিন একটা ভণ্ড প্রতারক শৃগাল মূষিককে দেখে একপায়ে ভর দিয়ে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বায়ু পান করছিল। শৃগালের এমন অদ্ভুত আচরণ দেখে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন মহাশয় আপনি কে? আপনার নাম কি? শৃগাল উত্তর দিল আমার নাম ধার্ম্মিক। শৃগালের মধ্যে এমন সাধুতা ছিল যে সে চারপায়ে ভর না করে একপায়ে ভর দিয়ে চলে কারণ পৃথিবী তার ভার বহণ করতে পারবে না। আবার খাবার গ্রহণ না করে বায়ু সেবন করে। শৃগাল সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সূর্য্যের পূজা করে। শৃগালের এমন সাধুতা দেখে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন তাঁর সমস্ত অনুচরেরা তাকে প্রণাম করার জন্য যাবেন। বোধিসত্ত্ব অনুচরদেরকে নিয়ে রওনা হলেন। পথিমধ্যে মূষিকদের প্রাণসংহার হতে লাগল। এইভাবে মূষিকের সংখ্যা কম হতে লাগল। মূষিকেরা ভাবছে আগে অনেক ঠেসাঠেসি করে থাকতে হতো কিন্তু এখন জায়গা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কেন? এই কথাটা বোধিসত্ত্বকে জানালেন। বোধিসত্ত্ব ভাবতে শুরু করলেন। বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সন্দেহ করলেন। শৃগালকে প্রণাম করে ফিরে যাওয়ার সময় অন্যান্য মূষিককে অগ্রভাগে রাখলেন এবং স্বয়ং সকলের পশ্চাতে থাকলেন। শৃগাল বোধিসত্ত্বের উপর লাফিয়ে পড়ল। তখন বোধিসত্ত্ব শৃগালকে বললেন তোমার সাধুতা ধর্মের জন্য নয়। তুমি প্রাণিহিংসার জন্য ধর্মের ধবজা বিচরণ করছ। মূষিকরাজ এক লাফ দিয়ে শৃগালের গ্রীবার উপর পড়ল এবং গলানীতে দংশন করে উহা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল। শৃগালের মাংস খেয়ে ফেলল। পরবর্তীতে সমস্ত মূষিকেরা নির্ভয়ে জীবন যাপন করতে লাগল।[২৯]

সুবর্ণহংস জাতক

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহের কিছুদিন পর তাঁর নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দরীনন্দা নামে তিনটি কন্যার জন্ম হয় এবং জন্মের পর বোধিসত্ত্বের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর কন্যারা অন্যের গৃহে

Dhaka University Institutional Repository

কাজকর্ম করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। পরবর্তীতে বোধিসত্ত্ব মানবদেহ ত্যাগ করে আবার সুবর্ণহংসের রুপ নিয়ে জন্মলাভ করেন। তাঁর পালকগুলি ছিল কুট্রিত সুবর্ণের ন্যায়। বোধিসত্ত্বের হঠাৎ মনে হলো আমি পূর্বজন্মে মানুষ ছিলাম এবং আমার তিনটি কন্যা এবং স্ত্রী ছিল। বোধিসত্ত্বের মনে হলো আমার একটা পালক দিলে ওরা বিক্রি করে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারবে। এটা চিন্তা করে বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে পালক দিয়ে যেতেন। এতে করে ব্রাহ্মণীর প্রচুর অর্থলাভ হতো এবং সুখে শান্তিতে দিন অতিবাহিত করতো । হঠাৎ লোভী ব্রাহ্মণী কন্যাদেরকে বলতে শুরু করলেন তোমার বাবা কখন আসা বন্ধ করবে এটা কেউ বলতে পারবে না। কারণ ইতর প্রাণীদের চরিত্র বুঝা অসম্ভব। এজন্য এবার আসলে তোমরা পালকগুলি ছিড়ে ফেলবা। কিন্তু তাঁর কন্যারা বাবার কষ্ট হবে একথা ভেবে রাজী হলো না। তারপর বোধিসত্ত্ব আবার একদিন আসলেন ব্রাহ্মণী তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁর সমস্ত পালকগুলি উপড়ে ফেলে দিলেন কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণীর কোন লাভ হলো না। ব্রাহ্মণীর হাতে পড়ার পর পরই পালকগুলি অন্য রকম হয়ে বকের পালকের মতো হয়ে গেল। কিছুদিন পর বোধিসত্ত্বের আবার পূর্বের মতো পালক উঠল এবং তিনি উড়ে গিয়ে নিজের স্থানে দিন অতিবাহিত করতে শুরু করে দিলেন এবং তাঁর স্ত্রী কন্যাদের সাথে আর দেখা করতে আসলেন না। [৩০]

কাক জাতক (১)

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাক যোনিতে জন্মলাভ করেন। একদিন রাজপুরোহিত নদী থেকে স্নান করে পোষাক পরিধান করে নগরে বের হলেন। ঠিক সেই নগরদ্বারের তোরণে দুইটা কাক বসা ছিল তারা ব্রাহ্মণকে দেখে একে অপরকে বলছে আমি তার মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করিব। কিন্তু দ্বিতীয় কাক বলল তোমার বুদ্ধিটা সঠিক নয় তারা ক্ষমতাবান লোক ধরা পড়লে সমস্ত কাকদের মেরে ফেলবে। কিন্তু কাক কোন কথা না শুনে ব্রাহ্মণ যেই তোরণের নিচে উপস্থিত হয়েছে ঠিক সেই মূহুর্তে ফুলের মালা না পড়ে তার মাথায় কাকবিষ্ঠা পড়ল। ব্রাহ্মণ রাগান্বিত হয়ে সমস্ত কাক মারার আদেশ দিল। ঠিক সেই সময়ে এক দাসীর ধান ছাগলে খাওয়ার ফলে ছাগলের গায়ে আগুন দিল। ছাগল আগুন নিভানোর জন্য এক তৃণ কুটীরের মধ্যে ছুটে গেল তখন তৃণকুটীরে আগুন লাগল। তৃণকুটীরের আগুন আবার হস্তীশালায় গিয়ে লাগল। এভাবে বহু হস্তীর শরীর পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেল। চিকিৎসকেরা তাদের আরোগ্য সাধন করতে না পেরে রাজাকে জানালেন। রাজা পুরোহিতকে বলিলেন আচার্য্য হস্তিবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করতে পারছে না। আপনি কোন ঔষধ জানেন কি? পুরোহিত বলল হ্যাঁ মহারাজ আমি এক ঔষধ জানি। কি করতে হবে বলুন।

Dhaka University Institutional Repository

কাকবাসা। রাজা বসাকাকের জন্য কাকমারার আদেশ দিয়ে দিলেন। কিন্তু বসা কাক পাওয়া গেল না। এদিকে কাককুলে মহাভয়ের সঞ্চার হলো। সেই সময় বোধিসত্ত্ব বহুশত কাকদেরকে নিয়ে মহাশ্মশানে সমস্ত কিছু জ্ঞাত হলেন এবং তিনি ভাবলেন আমি ছাড়া আর কেউ এদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। বোধিসত্ত্ব দশ পারমিতা স্মরণ করে রাজার আসনের নিম্নে উপস্থিত হলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন মহারাজ স্বেচ্ছাচার পরিহার করে প্রজাপালন করাই রাজধর্ম। কোন কিছুতে প্রস্তুতি নেওয়ার আগে সমস্ত বিষয়ে খুটিনাটি দেখা উচিত। রাজা ভাবছেন বোধিসত্ত্ব একথাগুলো কেন বলছেন। মহাশয় আপনার পুরোহিত শত্রুতাবশতঃ মিথ্যা কথা বলছে কাকের কখনও বসা থাকে না। বোধিসত্ত্বের কথা শুনে রাজা খুশী হলেন। রাজা খুশী তাঁকে কাঞ্চন ভদ্রপীঠে বসালেন। শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখালেন, কাঞ্চন পাত্রে রাজভোগ খাওয়ালেন এবং পানীয় পান করালেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন পণ্ডিতবর আপনি বললেন কাকের বসা নেই কেন। বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন-

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে থাকে নিরন্তর
এই দুই কারণে শুন নরেশ্বর
সর্ব্বজনে তারে শত্রু মনে করে
বসা নাহি জন্মে কাক-কলবরে।

এভাবে বোধিসত্ত্ব রাজাকে গাথার ছলে উপদেশ দিলেন। তিনি রাজাকে বললেন আপনি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জেনে তারপর অগ্রসর হবেন। রাজা মহাসত্ত্বকে পূজা করলেন। রাজার প্রতিদান হিসাবে তাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন। এবং সমস্ত প্রাণীর জন্য অভয় প্রার্থনা করলেন। ধর্মোপদেশ শুনে রাজার মন সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেল এবং সব প্রাণীর জন্য বিশেষ করে কাকদের জন্য প্রতিদিন প্রচুর আহারের ব্যবস্থা করলেন। [৩১]

শৃগাল জাতক (২) ঃ

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত এবং সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব শৃগাল রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বহুশৃগালদের নিয়ে এক শ্মশানে বাস করতেন। এক সময় রাজগৃহের মহোৎসবে বহুলোকের আগমন সৃষ্টি হলো। তন্মধ্যে একদল ধূর্ত্ত প্রচুর মদ্য ও মাংস সংগ্রহ করে এবং সুন্দর পোষাক পরিধান করে তারা কোন কোন সময় গানও পরিবেশন করছিল আবার সুরাপান করছিল, আবার কখনও মাংস ভক্ষণ করছিল। হঠাৎ একজন বলল আমায় মাংস দাও। অন্য লোকেরা বলল

Dhaka University Institutional Repository

মাংস শেষ হয়ে গিয়েছে। তন্মধ্যে একজন বলল আমি থাকতে কি মাংস শেষ হতে পারে। ধূর্ত্ত ব্যক্তি এই বলে একটা মুদগর নিয়ে নর্দ্দামা দিয়ে বের হয়ে শ্মশানে গিয়ে মুদগর হাতে নিয়ে মরার মতো হয়ে পড়ে আছে। বোধিসত্ত্ব ঠিকই ঐ ধূর্ত্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করলো এ মৃত নয়। বোধিসত্ত্বের সন্দেহটাই ঠিক। বোধিসত্ত্ব তাঁর কাছে গিয়ে দাঁত দিয়ে মুদগরের একদিক ধরে টানল কিন্তু লোকটা মুদগর ছাড়ল না। বোধিসত্ত্ব যে তার পাশেই ছিল এটা লোকটা বুঝতে পারেনি। লোকটিকে বোধিসত্ত্ব বললেন ধূর্ত্তরাজ তুমি যদি মৃত হতে তাহলে তুমি মুদগরটি জোরে টান দিতে না। লোকটি সাথে সাথে মুদগরটি বোধিসত্ত্বের গায়ে নিক্ষেপ করলো কিন্তু তাতে তাঁর দেহে আঘাত হানতে পারল না। ধূর্ত্ত লোকটি বোধিসত্ত্বকে কিছুই করতে না পেরে শ্মশান থেকে বের হয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে গেল। [৩২]

কাক জাতক (২)

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হঠাৎ একদিন একটি কাক তাঁর নিজের স্ত্রীসহ খাবারের জন্য সমুদ্রতীরে আসল এবং ঠিক সেই দিকেই কিছু মানুষ ক্ষীর, পায়েস, মাছ-মাংস এবং সুরা ইত্যাদি খাবার দিয়ে সমুদ্রতীরে নাগপূজা করতে এসেছিল। কাকেরা ঐ সমস্ত খাবার-দাবার আহার করলো এবং প্রচুর সুরা পানে মত্ত হয়ে সমুদ্রজলে ক্রীড়া করে স্নান করতে গেলে ঐ সময় দ্রুতবেগে একটি তরঙ্গ এসে কাকীকে সমুদ্রগর্ভে নিয়ে গেল এবং সমুদ্রের একটি মাছ কাকীর মাংস খেয়ে ফেলল এবং কাকীর মৃত্যু হলো। স্ত্রীর মৃত্যুতে কাক খুবই মর্মাহত হলো এবং সবাই এক হয়ে তারা চিন্তা করলো সমুদ্রের সব পানি নিষ্কাশন করে কাকীর উদ্ধার করবে। প্রয়োজনে এভাবে মুখ দিয়ে জল তুলতে শুরু করলো কিন্তু লবণাক্ত পানিতে তাদের কণ্ঠে যন্ত্রণা এবং চক্ষু রক্তের মতো লাল হয়ে তন্দ্রাবেশে পড়ে মরার মতো হয়ে গেল। কাকগুলো এমন হতাশ হয়ে পড়ল যে তারা যতই জল বাহিরে ফেলে কিন্তু ফেলতে না ফেলতে জল এসে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন কাকেরা ভাবল তারা সমুদ্রকে কখনোই জলহীন করতে পারব না। তখন তারা বিলাপ করে গাথা বলতে শুরু করলো। গাথা নিম্নরূপ-

লোণাজলে মুখ পুড়িল, কণ্ঠ শুকাইল
সাগর কিন্তু যাহা ছিল তাহাই রহিলো।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সব কাকেরা মৃত কাকীর পুচ্ছ কি সুন্দর ছিল, তাঁর চক্ষু,দেহ, মধুর কণ্ঠস্বর, সবই ছিল অত্যন্ত সুন্দর ছিল বলে বিলাপ করলো। এই সমস্ত গুণ ছিল দেখেই সমুদ্র তাঁকে অপহরণ করেছে। কিন্তু এই বিলাপ শুনতে শুনতে হঠাৎ করে সমুদ্র দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করে তাদের সম্মুখে এসে হাজির এবং অন্যান্য কাকের জীবন বাঁচাল। তা নাহলে তারাও তরঙ্গাঘাতে জলমগ্ন হয়ে নিহত হতো। সমুদ্র দেবতার দর্শনে তারা পালিয়ে গেল এবং তাদের সবার জীবন রক্ষা হলো।[৩৩]

শৃগাল জাতক (৩)

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব আবার শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর এক নদীতীরস্থ অরণ্যে বাস করতেন। একদিন খাদ্যের খোঁজে বের হলেন এবং দেখলেন এক বৃদ্ধ হাতী গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করে আছে। মৃত হাতীকে দেখে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন আমার প্রচুর খাদ্যের উপায় বের হলো এবং এটা দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত চালানো যাবে। তিনি প্রথমে হাতীর শুণ্ডে দংশন করলেন, কিন্তু উহা ছিল নাঙ্গলের ঈষার মতো কঠিন। তারপর দন্তে দংশন করলে কিন্তু তাতেও হাড়। পরবর্তীতে আবার কানে দংশন করলেন কিন্তু কানটি ছিল শূর্পের ন্যায় নীরস। আবার উদরে দংশন করলেন সেটা একটা ধানের গোলার মতো। পায়ে দংশন করলেন সেটা যেন উদূখল। আবার লাঙ্গুলে দংশন করলেন সেটা যেন মূষল। এইভাবে একের পর এক সব জায়গাতেই দংশন করলে কিন্তু কোথাও খাদ্যের উপায় পেল না। বোধিসত্ত্ব পরবর্তী উপায় হিসেবে হাতীর মলদ্বারে দংশন করলেন এবং সুমিষ্ট আহার গ্রহণ করলেন। এভাবে সুমধুর খাবার খেতে হাতীর কুক্ষির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখান তিনি বৃক্ক খেলেন, হৃদপিণ্ড খেলেন, পিপাসা পেলে তিনি রক্ত পান করতেন এবং নিদ্রার সময় হলে উদর বিস্তৃত করে ঘুমাতেন। এভাবে তিনি বেশ কিছুদিন আরাম আয়াশে কাটালেন। কিছুদিন দিন অতিবাহিত হলে গ্রীষ্মের সূর্য্যরশ্মিতে মৃত হাতীর চামড়া শুকিয়ে গেলে বোধিসত্ত্বের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিক্ষণে বাস করছিলেন। ধীরে ধীরে মাংসও শুকিয়ে গেল বের হওয়ার পথ না পেয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। সৌভাগ্যবশত কয়েকদিনের মধ্যেই প্রচুর বৃষ্টি হলো এবং মৃত হাতীর মৃতদেহ ভিজে ফুলে উঠল এবং মলদ্বার খুলে তার ভিতর দিয়ে নক্ষত্রের মতো আলো দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব খুবই খুশী হলো এবং তাঁর প্রাণরক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

হলো। তিনি হাতীর মলদ্বার থেকে নিজের মস্তক দিয়ে বাইরে চলে আসলেন। বোধিসত্ত্ব হাতী থেকে বের হয়ে আসার সময় রন্ধ্রপথে শরীরে লোম গজালো। তিনি মুক্ত হয়ে প্রথমে মুহূর্তকাল ছুটলেন, পরে আবার থামলেন এবং অবশেষে উপবেশন করে তাঁর নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন আমার এই দূর্দশার জন্য আমি দায়ী। কারণ লোভের জন্য আজ আমার এই অবস্থা হয়েছে এবং অনেক কষ্ট পেয়েছি। তখন থেকেই বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করলেন আমি আর মৃত হাতীর শরীরে প্রবেশ করব না এবং লোভের বশবর্ত্তীও হবো না। পরবর্তীতে বোধিসত্ত্ব সে স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেলেন এবং আর কখনও মৃত হস্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না লোভেরও বশবর্ত্তী হতেন না। [৩৪]

উপসংহার

প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বহু মূল্যবান বিষয় আছে যা আজকের পরিবেশ বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদগণ উপলব্ধি করছেন। জাতক সাহিত্যে অনেক পর্বত, হিমালয়, নদী, হ্রদ, পাহাড়, জলাশয়, প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন পশু,পাখী,বৃক্ষ ও ঋতুর নামোল্লেখ আছে। তাই পরিশেষে বলা যায় তথাগত ভগবান বুদ্ধ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় যেমন, শশ্মান, অরণ্যে, নদীর তীরে, হিমালয়ে, বৃক্ষমূলে অর্থাৎ অরণ্যচারী হয়ে বসবাস করতেন। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ কৃতজ্ঞতাবোধ। অতএব প্রকৃতি ও পরিবেশ মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে মানববিশ্ব উপকৃত হবে।

তথ্য নির্দেশনা

১. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির; মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ.২২১-২২২।

২. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৫১।

৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫১।

৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫২।

৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৩।

৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৪।

৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৫।

৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৩।

১০. পালি সাহিত্যে ধর্ম্মপদ ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানু, ১৯৯৭, পৃ. ১১৫।

১১. প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫-১১৬।

১২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫।

১৩. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী ঢাকা, আগষ্ট ১৯৮০, পৃ. ২৬০।

১৪. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (ষষ্ঠ মুদ্রণ), জাতক নং-২২।

১৫. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৩৭।

১৬. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১২।

১৭. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৩৬।

১৮. জাতক ঃ প্রাগুক্ত;জাতক নং-২৯।

১৯. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১১।

২০. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৪২।

২১. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৪৪।

২২. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৫৭।

২৩. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৭২।

২৪. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-৭৫।

২৫. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১১৩।

২৬. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১১৮।

২৮. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১২২।

২৯. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১২৮।

৩০. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১৩৬।

৩১. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১৪০।

৩২. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১৪২।

৩৩. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১৪৬।

৩৪. জাতক ঃ প্রাগুক্ত; জাতক নং-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জাতক সাহিত্যে নানা পেশা ও আর্থ সামাজিক অবস্থা

ভূমিকা

জাতকে প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য বিচার বিশ্লেষণে এ অধ্যায়ে জাতক সাহিত্যে নানা পেশা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার বর্ণনা ও নানা পেশার মানুষদের প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক অবস্থা উপস্থাপন করা হলো।

সমাজ জীবন

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের একটি আকর। জাতক সাহিত্য ধর্মীয়ভাব থেকে উদ্ভব হলেও প্রাচীন সমাজ জীবনের নিখুঁত চিত্র আলোচনা করা হয়েছে এখানে। তাই এটিকে বলা হয় প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি আর্দশিক সামাজিক গ্রন্থ। প্রফেসর অনুকূল চন্দ্র বলেন- "The Jatakas are of immense value from the points of view of Literature and art"।[১]

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের মতো কম-বেশী জাতি গোষ্ঠী ও বৃত্তিধারী এই দুই প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। বুদ্ধের সময় ভারতের সামাজিক ভিত্তি চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল যেমন-ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণের নামগুলো মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থেও [২] উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশী। সমাজে ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যোদ্ধা ও রাষ্ট্রশাসক। বৈশ্যরা ছিলেন ধনবান বিশেষ প্রভাবশালী সম্প্রদায়। দেশের আর্থিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড শূদ্ররা ছিল সবচেয়ে অবহেলিত তথা অসম্পৃশ্য।[৩] এছাড়াও নানা জাতের নানা লোকের নানান শিল্প ও পেশাকে আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো এসব মানুষেরা এদের একেক জনের পেশা ছিল একেক রকমের। তারা এজন্য নানান পেশা ও বৃত্তিতেই জীবিকা অর্জন করতেন। এভাবেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক একটি সামাজিক অবস্থা।

ক্ষত্রিয়রা মনে করতেন তারাই সমাজের সবচেয়ে উচ্চশ্রেণি বা উচ্চধর্মের জাতি। তাই ক্ষত্রিয়রা প্রথানুযায়ী রাজ্য শাসন করতেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যও

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণগণ তাদের উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু ধর্মীয় পূজা পার্বণ ছাড়া ক্ষত্রিয়রা কোন সুযোগ সুবিধা নেয়ার আশা ব্রাহ্মণদের উপর করতো না। ব্রাহ্মণরা ধর্মীয় জীবন যাপনে উচ্চস্তরে থাকলেও সমাজের নাগরিক জীবনে তারা দ্বিতীয় স্তরের। এজন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সব সময় একটা মনোমালিন্য থাকতো এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বদা লক্ষ্য করা যেত।

ক্ষত্রিয়দের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকলেও প্রথানুসারে সমাজ অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা করতো ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণরা অধ্যাপনা করলেও আবার দেখা যেত যে, ব্রাহ্মণদের অনেক জটিল তাত্ত্বিক বিষয়ের সমাধান করতো ক্ষত্রিয়রা। উল্লেখিত অরক জাতকে (জাতক নং-১৬৯) তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। পরস্পরগত শিক্ষাদানই ছিল অন্যতম পেশা। ক্ষত্রিয়রা সকল বর্ণের উপরে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগের উপর নির্ভর করতো। এছাড়া খ্রি:পূর্ব ষষ্ঠ শতকে তথাগত বুদ্ধ ও মহাবীর জৈন এই দুজনই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত আচার্যের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য, যারা নানা জটিল তাত্ত্বিক বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এছাড়া সারিপুত্র ও মহামোগ্গলায়ন ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তখনকার সময় ব্রাহ্মণরা উচ্চ বংশজাত বলে নিজেদেরকে দাবি করতেন।[৪] কিন্তু ভগবান বুদ্ধ এই দাবিকে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি মানুষকে কর্মের উপর ভিত্তি করেই উচু নিচু বংশ নির্ধারণ করতেন। তিনি বলেন-

"ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
সম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো"[৫]

অর্থাৎ জটা, গোত্র কিংবা জাতির পরিচয়ে পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যার অন্তরে
সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

তাই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মলাভ করে কিংবা জটা বা বংশের পরিচয়ে কেহ ব্রাহ্মণ হতে পারবে না। উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী, আত্মসংযামী, সৎ, জ্ঞানী, পাপ হতে সুপ্ত, অহংকার কিংবা দোষমুক্ত এবং জ্ঞানের সাধনায় লব্ধ থাকেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এভাবেই তথাগত ভগবান বুদ্ধ সবার মধ্যে এই উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই আপন কর্মপ্রচেষ্টায় সমাজ পরিত্যক্ত ছেলেও নিজ প্রচেষ্টায় উচ্চ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল।[৬]

এভাবে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় আপন প্রতিভার গুণে এবং আপন কর্মের দ্বারা মানুষ নিজেকে উচ্চ পদস্থ করেছিল। ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের মধ্যেও কিন্তু জাত বিচার কিংবা শ্রেণি বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

দেখাননি। তাঁর সংঘের মধ্যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, নাপিত, ঝাড়ুদার, গায়ক, গায়িকা, গণিকা সব ধরনের মানুষকে প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন। এই বৌদ্ধ সংঘভুক্ত ব্যক্তিরা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তিতেই পরস্পর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। প্রথানুযায়ী সমাজের তৃতীয় স্তরে বা তৃতীয় স্থানে ছিলেন বৈশ্য শ্রেণি বা বণিক শ্রেণি। বণিকদের সময় ব্যবসা বাণিজ্য বৌদ্ধদের অনূকুলে ছিল। তাই বণিকরা সামাজিক মর্যাদা পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বণিক প্রধানরা যেমন-শ্রেষ্ঠী, স্বার্থবহি, জ্যৈষ্ঠক, প্রভৃতি সামাজিক মর্যাদা উচ্চ বর্ণের লোকদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। বণিকরা শ্রেণি সেনাপতি কিংবা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মতো মর্যাদা পেতেন এবং বেসরকারি কর্মকর্তারূপে বিস্তার লাভ করতেন।[৭]

উল্লেখ্য, তথাগত ভগবান বুদ্ধের সময়ে অনাথপিণ্ডিক ছিলেন নগরের শ্রেষ্ঠী তিনি ভগবান বুদ্ধের একজন পরম উপাসক ছিলেন। তিনি ধর্মানুরাগী এবং অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, জন সাধারণের প্রকৃত বন্ধু।[৮] অনাথপিণ্ডিকের নাম জাতক সাহিত্যের বহু জাতকে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সুজাতা জাতক (জাতক নং-২৬৯), শ্রী জাতক (জাতক নং-২৮৪), ভদ্রঘট জাতক (জাতক নং-২৯১) প্রভৃতি। এই শ্রেষ্ঠী ছিলেন প্রজাবৎসল এবং শাসক হিসেবে সুদক্ষ। এছাড়াও বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি পশুপালন ও কৃষিকাজ করতেন।

পরস্পরাগত অনুসারে সমাজের চতুর্থ স্তরে স্থান ছিল শূদ্রের। প্রাচীন সমাজে শূদ্রদের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। শূদ্ররা সব সময় উচ্চ শ্রেণির দাস হয়ে জীবন যাপন করতো ও অপমান, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার শিকার হতো। তারা নানা রকম শিল্পাশ্রয়ী ও পেশাধারী শ্রেণিতে গঠিত ছিল। এদেরকে সমাজে নিম্নশ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে "দাসা চ কম্মকরা" অর্থাৎ ক্রীতদাস ও শ্রমিক।[৯] এদের সঙ্গে শিকারী, মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির লোকেরও উল্লেখ আছে।

শূদ্রদের সামাজিক কোনো মর্যাদা দেওয়া হতো না এজন্যই তারা সমাজের নির্দিষ্ট স্থানে বাস করতো। তাদের মধ্যে কেউ বড় বৃক্ষের নিচে, পাহাড়ে, বনে অর্থাৎ বিভিন্ন ছিন্নমূলক স্থানে বসবাস করতো।[১০] এরা ছাড়াও অপণ্ণক জাতকে[১১] পাঁচ প্রকারের নীচ লোকের নাম পাওয়া যায়। যেমন, বেণ, নিষাদ, রথকার, পুক্কশ ও চণ্ডাল। এরা সবাই নীচ জাতি বলে সমাজে পরিচিত। এরা সবাই একেক কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এছাড়াও শীলমীমাংসা জাতকে[১২] চণ্ডাল ও পুক্কশ নামক কয়েকটি নিম্নবর্ণের

Dhaka University Institutional Repository

নামোল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট জীবিকা থাকতো অর্থাৎ তারা শশ্মানে, বড় বৃক্ষে এবং বিভিন্ন বনাঞ্চলে বসবাস করতো।[১৩] মাতঙ্গ জাতকে চণ্ডাল[১৪] এবং তাদের বেশভূষা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। অন্যদিকে পুক্কশরা মন্দির কিংবা প্রাসাদ পরিস্কার কাজে নিযুক্ত থাকতো।[১৫] মিলিন্দ প্রশ্ন [১৬] গ্রন্থেও চণ্ডাল বা পুক্কসের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ধনী কিংবা রাজারা দাস-দাসী রাখতেন। দাস-দাসী ছাড়া তারা কোন কাজ নিজেরা করতেন না। একেক কাজের জন্য একেক রকম দাস-দাসী ব্যবহার করতেন। এইরূপ দাসদাসীদের মধ্যে কেউ ছিল যুদ্ধ বন্দী, কেউ ছিল বিচারে সাজাপ্রাপ্ত। নিজের ইচ্ছামত কেউ কেউ দাস-দাসী নিয়োগ করতে পারতো। প্রথানুসারে দাস-দাসীর ছেলে মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রে দাসবৃত্তি করতো। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় যে, দাস-দাসী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বংশজাত নির্ণয় করা হতো না। এমনকি যে কোন শ্রমজীবি লোক ও উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিকে দাস হিসেবে রাখতে পারত।[১৭]

ধর্মীয় অবস্থা

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সে সময়ে সমাজ ব্যবস্থা ছিল জাতিভেদ প্রথার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তথাগত প্রথাটা তাঁর ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে নির্মূল করেছেন এবং বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধপূর্বোত্তর ও বুদ্ধ সময়কালীন ধর্মীয় অবস্থা এবং জনমানবের চিন্তা-চেতনা ছিল অত্যন্ত কুসংস্কারচ্ছন্ন। ধর্মীয় জীবন-যাপনে সে সময়কার জাতি-গোষ্ঠী ছিল নানা মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যাগ-যজ্ঞ, বলি প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এছাড়া বৃক্ষদেবতা, সূর্যদেবতাসহ নানা নদ-নদী, সাগর, পর্বত, পশু, পাখি প্রভৃতি প্রাণী ও প্রকৃতি পূজায় তারা বিভোর ছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়কালে বা আবির্ভাবকালে ব্রাহ্মণদের কঠোরতাও ছিল অনেক বেশি। বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল। সে সময় ভারতবর্ষ অনেকগুলো ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণরাই তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যাগ যজ্ঞ করে পশুবলি দিয়ে পশুরক্তে দেশ প্লাবিত করে ফেলতেন। আর ব্রাহ্মণরা এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ধনলাভ, স্বাস্থ্য, ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ হবে বলে আশা করতেন। কিন্তু যাগ-যজ্ঞ দ্বারা মানুষের জীবনে কখনো সুখ শান্তি যে আসে না বা আসতে পারে না তারা এটা কখনোই বুঝতেন না। তারা এতই মিথ্যা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন যে, এ জ্ঞান সমর্থ লাভে তারা অক্ষম ছিলেন। তারা মনে করতেন যাগ-যজ্ঞ করলেই চিরস্থায়ী সুখ আসবে। জাগতিক মঙ্গল, সুখ–শান্তি ও মুক্তির আকাঙ্খায় ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মাদেরকে দেবতা মনে করতেন এবং তাদের উপাসনা করতেন। ব্রহ্মাকে মানুষের সৃষ্টিকর্তা মনে করতেন এবং সবাই ভাবতেন ব্রহ্মার কাছেই সুখলাভ হবে। এসব অন্ধবিশ্বাসে সে সময় মানুষ কুসংস্কার ও মিথ্যাতে নিবৃত্ত ছিলেন।[১৮] সে সময়কার মানুষের মনে আরো বিশ্বাস ছিল যে সকালে উঠে শ্বেত, বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, দুগ্ধরত গাভী, নতুন কাপড় প্রভৃতি দর্শন করলে শুভফল আসবে। নিগ্রোধমৃগ জাতক (জাতক নং-১২) হতে জানা যায়, সে সময়ে ন্যাগ্রোধ ও শাখামৃগের দলে পাঁচশত মৃগ থাকতো। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত লোকজন নিয়ে প্রতিদিন মৃগ শিকার করতেন এবং তিনি প্রত্যেকদিন তার জন্য এক একটি মৃগ শিরচ্ছেদ করা হতো ।

প্রাক-বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন ছিল যার ফলে সত্য দৃষ্টি ও সত্য জ্ঞান লাভে অসমর্থ ছিল। ভগবান বুদ্ধ এই মিথ্যাদৃষ্টিতে বশীভূত না হতে বলেছেন। তিনি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে নির্বাণ লাভের মোক্ষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১৯] জাতকে বহু ধর্ম্মানুশাসকের নাম উল্লেখ ছিল, যাঁরা সমাজে বিভিন্ন ধর্মমত সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। তন্মধ্যে পাদাঞ্জলি জাতক (জাতক নং-২৪৭), গিরিদন্ত জাতকে (জাতক নং-১৮৪),পুটভক্ত জাতক (জাতক নং-২১৪), কচ্ছপ জাতক (জাতক নং-২১৫) প্রভৃতি। ঐ সকল জাতকে ধর্ম্মানুসারী ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের বহু মতামত দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত এবং নানাভাবে প্রচারিত ৬২ প্রকার ধর্ম মতবাদকে ভগবান বুদ্ধ নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন যা- শাশ্বতবাদ, একস্স শাশ্বতবাদ, অন্তানন্তিকবাদ, অমরাবিখেপিকাবাদ, অধিচ্ছসমুপ্পন্নিকাবাদ, উদ্ধমাঘতনিকাবাদ, উচ্ছেদবাদ এবং দৃষ্টধর্ম নির্বাণবাদ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। শাশ্বতবাদীরা মনে করতেন জগতের সবকিছু ধ্বংস হবে কিন্তু আত্মা কোনদিন ধ্বংস হবে

Dhaka University Institutional Repository

না। মানুষের জীবনে জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি আসলেও এসবের পরিবর্তন হলেও আত্মার কোন রূপ পরিবর্তন হবে না। তাদের কাছে আত্মা শাশ্বত, আত্মা অমর ও অবিনশ্বর।[২০]

অন্যদিকে একাংশ শাশ্বতবাদ এবং একাংশ অশাশ্বতবাদী বিশ্বাসীদের নিকট জীব অথবা মানুষের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই শুধু পরিবর্তন হয়, আত্মা কখনো পরিবর্তন হয় না। এজন্যই এদেরকে বলা হয় একাংশ শাশ্বতবাদ এবং একাংশ অশাশ্বতবাদ।[২১] অন্তানন্তিকবাদীরা ধ্যানের অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর আকার গোলাকার, পৃথিবীর আকার বিস্তৃত, পৃথিবীর আয়তন অনন্ত এবং উভয় পার্শ্ব বিস্তৃত প্রভৃতি ধর্মমত প্রচার করতেন। বুদ্ধ সমকালীন ভারতে সংশয়বাদ নামে আরেক ধর্মবাদী দার্শনিক ছিলেন যাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ যুক্তি তর্কে মানুষকে অভিভূত করতেন। ভগবান তাঁদের বাক চাতুর্যের জন্য 'অমরাবিক্ষেপিকা' বলে অভিহিত করেন। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Evasive Disputant। এসব ধর্ম দর্শনবাদীরা ভালমন্দ, কুশল-অকুশল, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। একান্ত ভাল কিংবা একান্ত মন্দ বলে জগতে কোন কিছু বিদ্যমান নেই। এ কারণে এসব দার্শনিকেরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না। এজন্য তাঁরা সংশয়বাদী। তাঁরা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অমর থাকতে চান। তাই এসব মতবাদকে বলা হয় অমরাবিক্ষেপিকা।[২২] ঐদিকে অধিচ্ছসমুপ্পন্নিকা নামে অন্য একটি ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা জগতের কার্যকারণ নিয়ম-নীতিকে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে জগতের সবকিছু অকারণবশত সৃষ্টি হয়েছে। যা ঘটে তাও অকারণে হয়। এরা অদৃষ্টবাদী। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের মতে জগতের কোন বস্তু অকারণবশত সৃষ্টি হতে পারেনা। জাগতিক সকল ঘটনা সকল বস্তুকার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বিনা কারণে কোন কিছু ঘটে না। উদ্ধমাঘতনিকা ধর্ম মতবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, আত্মা সংজ্ঞাযুক্ত; এর কোন পরিবর্তন হয় না। আবার কেউ মনে করে আত্মা অসংজ্ঞাযুক্ত। আত্মাসংজ্ঞাযুক্ত অসংজ্ঞাযুক্ত উভয়ই।[২৩] উচ্ছেদবাদীদের মতে পাপপূণ্যের কোন ভেদাভেদ নেই। ভালমন্দ শুধুমাত্র ইহলোকে সুখে থাকার জন্য। তাদের মতে মানুষের মৃত্যুর পর কোন অস্তিত্ব থাকে না সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই মৃত্যুর পর কর্মের ভাল-মন্দ বলতে আর কিছুই নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষে দৃষ্টধর্ম নির্বাণ নামে ধর্মমত বিশ্বাসীরা ছিলেন যাদের মতে মানুষ ইহজীবনে নির্বাণ লাভ করতে পারে। তারা মনে করে জগতের যত দু:খ আছে তা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করলেই নির্বাণ লাভ করা যায়। [২৪]

তাই প্রাচীন ভারতে নাগরিক জীবনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বুদ্ধ এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন যা কর্মনির্ভর এবং শুদ্ধাচার। তবে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিকালের প্রাচীন ভারতবর্ষে নগরবাসীদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্রভাবে কোন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারিত হয় নি। কিন্তু নগরজীবনে ধর্মীয় উপাসনালয়, নগরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সম্মেলন প্রভৃতি ধর্মীয় অবস্থার এক মনোজ্ঞ পরিচয় পাওয়া যায়, তবে সেকালেও নগরবাসীরা যে কম-বেশি নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল না তা কিন্তু নয়। যজ্ঞ ও জটিল ক্রিয়ানুষ্ঠান সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।[২৫] মহাবর্গ গ্রন্থ থেকেও জানা যায় [২৬] এই ধর্মীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে প্রচুর পশু নিধন করা হতো। এই পশু নিধনের ফলে নগরগুলো রক্তে প্লাবিত হতো কিন্তু তথাগত ভগবান বুদ্ধ প্রাণী হত্যার বিরোধী ছিলেন। এভাবে ধর্মীয় অবস্থার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। প্রাচীন পর্বে বৈদিক ধর্মাশ্রিত পুরোহিত সম্প্রদায়রা ক্ষত্রিয়দের নিকট চলে আসে। বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্মের দুইজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক তথাগত বুদ্ধ ও নিগ্রন্থজ্ঞাতিপুত্ত উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। এমনকি সেকালে অনেক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সারিপুত্র ও মহামোগ্গলায়ন ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন পালি সাহিত্যে এবং মহাবর্গে[২৭] এদের নাম পাওয়া যায় এবং বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও মোগগলায়ন প্রথম জীবনে সঞ্জয় বেলটঠিপুত্তের শিষ্য ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা প্রজ্ঞায় ও ঋদ্ধিতে এই দুই প্রধান শক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। এজন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈদিক ভিত্তিক জটিল ক্রিয়ানুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞ ধর্মাপ্রচারের পরিবর্তে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও গ্রহণ যোগ্য সহজ নীতি হয়েছিল। মূলত বৌদ্ধ ও জৈন এই ধর্মের অধ্যয়ন ও অনুশীলন হয়েছিল বৌদ্ধ ও জৈন দুই ধর্মের প্রধান দুই শিষ্যের নাম জাতক সাহিত্যে বহু জাতকে পাওয়া যায়। উল্লেখিত লক্ষণ জাতক (জাতক নং-১১), দেবধর্ম্ম জাতক, (জাতক নং-৬), সতংকিল জাতক, (জাতক নং-৭৩) মহাজনক জাতক (জাতক নং-৫৩৯), ত্রিপর্য্যস্তমৃগ জাতক, (জাতক নং-১৬), তিত্তির জাতক (জাতক নং-৩৭), প্রভৃতি জাতকে নাম পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় সাধনার মূল লক্ষ্য হচেছ নির্বাণ বা বিমুক্তি। এই নির্বাণ লাভ করতে হলে প্রয়োজন শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। এই শীল সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন ছাড়া নির্বাণ লাভ করা কখনোই সম্ভবপর নয়। মূলত এই তিনটি বিষয় সাম্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সার্বজনীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এই ধর্মে কতকগুলো বহুল প্রচলিত অনুষ্ঠান দেখা যায়। বৌদ্ধরা সাধারণত ধুপ, বাতি, ফুল, চৈত্য, বোধিবৃক্ষ কিংবা বুদ্ধমূর্তিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেন। এরকম পূজা করার মধ্যে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

চাওয়া পাওয়ার কোন কামনা-বাসনা থাকে না। একমাত্র বুদ্ধকে পথ প্রদর্শক হিসেবে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশের তা উপায়বিশেষ। এটা মূলত নির্বাণকামীদের জন্য বেশি প্রয়োজন না হলেও স্বল্পজ্ঞানী মানুষের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাণকামীদের বেশী প্রয়োজন না হলেও যারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও সল্পজ্ঞানী মানুষের ধর্মীয় আবেগ সন্তুষ্টিকরণে করার জন্যে একরম অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। তাহলে এসব ধ্যান ধারণা আস্তে আস্তে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তাই দেখা যায় ধর্ম প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সব শ্রেণির নাগরিকেরা এতে আকৃষ্ট হয়েছিল। যার ফলে ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিটি নগরে বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার এসেছিল।[২৮]

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্মের প্রভাব ছিল। এই জৈন বংশের মহান প্রবর্তক ছিলেন নিগণ্ঠনাতপুত্ত। আবার এই জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর এর নাম এর বিশেষ খ্যাতি ছিল। জাতক সাহিত্যেও এই মহাবীরের নাম (জাতক নং-২৪৬) পাওয়া যায়। জৈন দর্শন অনেকান্তবাদ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আত্মা যেমন দেহের সর্বত্রই বিদ্যমান তেমনি পৃথিবী, জল, বায়ু আকাশাদিতেও ব্যপ্তি। জৈনরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী।[২৯] এই মহাবীরের জন্মস্থান ছিল বৈশালী। এই জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল বৈশালী, পাবা, রাজগৃহ। মূলত এসব কেন্দ্রস্থল থেকেই জৈনধর্ম প্রচার করতেন এবং আরো অন্যান্য স্থানেও ধর্মবাণী প্রচার করতেন। এই প্রসিদ্ধ নগরগুলো জাতক সাহিত্যের গুরুত্বপুর্ণ নগরী হিসেবে সুপরিচিত। জৈনরা অহিংস নীতি আদর্শের উপর বেশি জোর দিতেন। তবে জৈনরা কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন। কৃচ্ছতা সাধনের উপর জোর বৌদ্ধদের চেয়ে জৈনরা বেশি জোর দেখাতেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। [৩০]

প্রাচীন ভারতবর্ষে জৈনধর্ম প্রচারক ছাড়াও আরো ছয়জন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শ্রমণ ধর্মোপদেষ্টার নামোল্লেখ পাওয়া যায় যাঁদের নাম বৌদ্ধ সাহিত্যে অর্থাৎ জাতক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধতা অর্জন করেছিল। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মীয় অন্যান্য শাস্ত্রগুলোতে জনসমাজে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বস্তুত এই ছয়জন দার্শনিক মতবাদ এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রাচীন যুগে জনসাধারণের ভিতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। উক্ত ছয়জন ধর্মীয় উপদেষ্টারা হলেন- পূরণ কস্সপ, মক্খলী গোসাল, অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন,

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত ও নিগণ্ঠনাতপুত্ত। এই ছয়জন ধর্মীয় শ্রমণের নাম জাতক এবং মিলিন্দ প্রশ্নে[৩১] পাওয়া যায়। উল্লেখিত মহাবোধি জাতক (জাতক নং-৫২৮), তেলোবাদ জাতক (জাতক নং-২৪৬), সঞ্জীব জাতক (জাতক নং-১৫০) প্রভৃতি জাতকে ছয়জন ধর্মীয় শ্রমণের নাম পাওয়া যায়।

নিম্নে এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনদর্শন তুলে ধরা হলো :

পূরণ কস্‌সপ

প্রাচীন সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে আচার্য পূরণ কস্‌সপের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছিল। এই ধর্মীয় শ্রমণ ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসারের সমসাময়িক। তিনি অক্রিয়বাদ ধর্ম প্রচার করতেন।[৩২] তাঁর মতবাদ হচ্ছে আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সুকর্ম বা দুস্কর্ম কোন কর্মেই ফল ভোগ করে না, তাঁর মতে দেহই কাজ করে। তিনি বলেন যাগযজ্ঞ, দানধ্যান এসব সৎকর্মে সেরূপ পূর্ণ হয় না তদ্রুপ প্রাণী, হত্যা, চুরি করা, মিথ্যা ভাষণ এরূপ অসৎ কর্মে মানুষের কোন প্রকার পাপ হয় না। কাজেই মানুষ ভালমন্দ যে কাজই করুক না কেন আত্মার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক দেহের সাথে এবং দেহই কর্মফল ভোগ করবে।[৩৩]

আচার্য মক্‌খলি গোসাল

এই ধর্মীয় শ্রমণের মতে জগতের সকল জীবই পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে, অর্থাৎ পুণর্জন্মই মোক্ষ লাভের পাত্র। জগত নিয়তির দ্বারা পরিচালিত। তিনি নিয়তি মতবাদ পোষণ করেছেন। সুতরাং তিনি কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার মতে নিয়তি জীবকে পরিচালনা করে, জীবের নিজস্ব কোন বল বা সামর্থ নেই।

আচার্য অজিত কেসকম্বলী

তিনি জড়বাদী মত পোষণ করেছিলেন বা পোষণকারী। তিনি কর্মফলে বিশ্বাসী নয়। তাঁর মতে জীবন পঞ্চভূতের সমষ্টি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। মৃত্যুর পরে এগুলো বিলীন হয়ে যায়। একে বৌদ্ধগ্রন্থে 'উচ্ছেদবাদ' বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আচার্য পকুধ কচ্চায়ন

কচ্চায়নের মতে জীব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দু:খ এবং জীব এই সাত ভূতের সমষ্টিগত। তিনি শাশ্বতবাদ মতবাদটি প্রকাশ করেছেন, তাঁর মতে সমষ্টিগত সাতটি ভূত ও অব্যয়। এগুলো যেমন একদিকে অজাত এবং অন্যদিকে নতুন কিছু সৃষ্টিতেও অসামর্থ্য ।

আচার্য সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত

উল্লেখ্য যে, তিনি অজ্ঞানবাদী সঞ্জয়ই নামে পরিচিত। তাঁর মতবাদকেই 'অজ্ঞানবাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে উল্লেখিত অমরাবিখেপিকা মতবাদই ছিল আচার্য সঞ্জয়ের মতবাদ। তিনি ভাল-মন্দ কোনটার পক্ষে-বিপক্ষে বলতেন না। কারণ কারও পক্ষে ভাল এবং কারও পক্ষে খারাপ বললে কেউ অসন্তোষ হতে পারে এই জন্য কোন মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। অর্থাৎ দ্ব্যর্থক বাক্য ব্যবহার করতেন। যার দুটি অর্থ ভাল-মন্দ দু'টিই থাকতো। এজন্য তাঁকে 'অজ্ঞানবাদী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আচার্য নিগণ্ঠনাতপুত্ত

নিগণ্ঠনাতপুত্ত ক্রিয়াবাদ বা কর্মবাদ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। তিনি সর্বদা কর্মের ফলাফলের উপর বেশি জোর দিতেন। তিনি সৎকর্মে সুফল এবং অসৎ কর্মের কুফল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। তিনি বলতেন কেউ পাপকর্ম হতে রক্ষা পবে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মের জন্য পাপ কিংবা পুণ্য ভোগ করতে হবে সুখ বা দুঃখ পাওয়া সুকর্ম বা দুস্কর্মের উপর নির্ভরশীল। আত্মা, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক তাঁর মতবাদে কোন স্থান নেই।[৩৪]

প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধর্মীয় শ্রমণদের যে কত প্রভাব ছিল তা নগরবাসীদের কাছ থেকে উপলব্ধি করা যায়। মিলিন্দপ্রশ্ন নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে করম্বিয় নামক এক ব্যক্তি করম্বিয় নগরীতে এক নগ্ন সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় পান্তর জাতকে (জাতক নং-৫১৮)। প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নগরের বিভিন্ন স্থানে বহু ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বসবাস করতেন। এসব পুরোহিতদের জন্য ত্রিবেদ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল।

উপরোক্ত ছয়জন ধর্মীয় শ্রমণ ছাড়াও প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্যে আরও পাঁচজন ধর্মীয় অনুশাসকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের কাজ ছিল অর্থ ও ধর্মের অনুশাসন করা। তাঁরা ছিলেন পাঁচ

Dhaka University Institutional Repository

মতবাদী। মহাবোধি জাতকে [৩৫] তাঁদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচজন ধর্মোপদেষ্টারা পাঁচ প্রকার মতবাদে ভিন্ন দর্শনের পরিচয় দিয়েছিলেন ঃ যেমন-১. অহেতুবাদী ২. ইস্সকারণবাদী ৩. পুবেব্কতবাদী ৪. উচ্ছেদবাদী ৫. খত্তবিজ্জাবাদী।

নিম্নে পাঁচজন ধর্মমতবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. **অহেতুবাদীঃ** অহেতুবাদীদের অধিচ্ছসমুপ্পন্নিকাবাদের (Fortuitous originations) স্বমার্থক বলা হয়েছে। এই অহেতুবাদীদের মতে জগতের সব বস্তু অকারণবশত সৃস্টি হয়েছে, এর সৃষ্টির পেছনে কোন কার্যকারণ নেই। জগতের সব কিছু অহেতুকভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না।

২. **ইস্সকারণবাদী (Theist)-** ইস্সকারণবাদী চিন্তাবিদরা মনে করতেন জগতের যা সৃষ্টি হয়েছে সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। জগৎ, সংসার এবং যাবতীয় বস্তু একজন সর্বোময় কর্তা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

৩. **পুবেবকতবাদী (Fatalist)-** এরা পূর্ব কর্মকৃত ফলের উপরই নির্ভর করতেন। পূর্বে সুকর্ম ও দুস্কর্মের উপর কুশল ও অকুশল ফলাফলের উপর নির্ভর থাকতো।

৪. **উচ্ছেদবাদী (Annihilationist)-** এদেরকে নশ্বরবাদী বলা হয়েছে। তাই নশ্বরবাদী প্রচার করতেন জগতের যাবতীয় বস্তুরই উচ্ছেদ হয়। কর্মফল বলতে এবং পরলোক বলতে কিছু নেই।

৫. **খত্তবিজ্জাবাদী (Militarist)-** এরা এক নায়কতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসী। খত্তবিজ্জাবাদী বলতেন পাপ বলতে কিছু নেই, এমনকি পিতামাতা হত্যায়ও কোন পাপ নেই নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পাপ-পুণ্যের মতামত নির্ধারণ করে থাকেন। মাতা পিতরো পি মারেত্বা অওনো বা অথো কামেতবেবা।[৩৬]

উল্লেখ্য যে, ধর্ম প্রচারকালে নানা শ্রেণির নগরবাসীর সাথে ধর্মপ্রচারকদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ধর্মপ্রচারকেরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর উপদেশ দান করতো। এজন্য নগরবাসীরা ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারকগণের উপর নির্ভর করতেন। এছাড়া ধর্মের জন্য ধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দান করতেন, ধর্ম উপাসনালয় নির্মাণ করতেন। এমনকি ধর্মপ্রচারের জন্য নানা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন ।

প্রাচীন ভারতে মগধরাজ, বিম্বিসার, অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিত, শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক এবং বৈশালীর আম্রপালি বৌদ্ধসংঘে প্রচুর অবদানের কথা জানা যায়। উল্লেখ্য শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক বৌদ্ধ সংঘের জন্য ৮০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করে জেতবন বিহার দান করেছিলেন। যাঁর নাম বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে তথা বৌদ্ধ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এছাড়া নাগরিকরাও বৌদ্ধ সংঘের জন্য সমষ্টিগতভাবে সর্বদা দানকর্ম বহাল রাখতেন। শ্রাবস্তী ও রাজগৃহের অধিবাসীরা প্রায়ই বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘে ভোজনদান করতেন।[৩৭] ধর্মীয় অবস্থার মধ্যে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, দরিদ্রের সাহায্য প্রদান। 'বিশন্তর জাতক'[৩৮] হতে রাণী পুষতী দেবীর কথা জানা যায়। রাণী পুষতী দেবী জেতুত্তর নগরীর চারপাশ, মধ্যভাগ এবং রাজপ্রাসাদের পার্শ্বে দানশালা তৈরি করেছিলেন। এই দানশালায় প্রতিদিন গরিবদের জন্য ছয় লাখ মুদ্রা ব্যয় করতেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্ম প্রবর্তকদের মৃত্যুর পরে তাঁদের পবিত্র মরদেহ প্রচুর মান সম্মান ও ভক্তি সহকারে সৎকার করা হতো। তথাগত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মরদেহ জাকজমকপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সৎকার করা হয়েছিল। দীর্ঘ নিকায় হতে জানা যায়, বুদ্ধের পবিত্র মরদেহটি কুসিনগরের নাগরিকরা উত্তর তোরণ পথে নিয়ে যায় এবং পূর্বতোরণ পথ দিয়ে বাহির করেন। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মরদেহটি সপ্তাহকাল ধরে দেহাবশেষের সম্মানে এক বিশাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। তখনকার সময়ে ধর্মীয় আচার্য, রাজা এবং আপন বংশের কোন লোক মারা গেলে তাঁর দেহাভস্মের উপর স্তুপ বা চৈত্য নির্মাণ করে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের প্রথা চালু ছিল। মহাপরিনির্বাণ সূত্র হতে জানা যায় তথাগত বুদ্ধ, তথাগতের শ্রাবক, পচ্চেক বুদ্ধ ও রাজচক্রবর্তী রাজা এ চারজন মহাপুরুষের দেহাবশেষের উপর স্তুপ নির্মাণের কথা জানা যায়। উল্লেখ আছে, তথাগত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মরদেহ সৎকারের পর পুতাস্থি আট ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কপিলাবস্তু, বৈশালী, রাজগৃহ, পাবা, কুসিনারা প্রভৃতি নগরের অধিবাসীরা আট ভাগের এক অংশের স্তুপ নির্মাণ করেন এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক পূজা করেন। এই চৈত্য নির্মাণের প্রথা প্রাক বৌদ্ধযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীদের ধর্মীয় জীবনের প্রতিও উদ্দীপনা ছিল। তখনকার সময়ে পুরুষদের মতো স্ত্রীলোকেরাও উচ্চতর শ্রামণ্যফল লাভ করতেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতির ব্যাপারে পুরুষের সমতুল্য ছিল। তারা মার্গফল, ধ্যানমার্গ, অভিজ্ঞতা, নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। তারা আর্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গ সাধনা করেছিলেন এবং ফলও লাভ করেছিলেন। উচ্চতর ভিক্ষুণীদের মধ্যে ছিলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, ধর্মাদিন্না, উৎপলবর্ণা ভদ্রাকপিলানী উল্লেখযোগ্য। এই ভিক্ষুণীদের নাম জাতক সাহিত্যের বহু জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিশন্তর জাতকে (জাতক নং-৫৪৭) ধর্মাদিন্না, মহাহংস জাতকে (জাতক নং-৫৩৪) ক্ষেমা, মহাজনক জাতক (জাতক নং-৫৩৯) উৎপলবর্ণা, অভ্যন্তর জাতকে (জাতক নং-২৮১) মহাপ্রজাপতি গৌতমী, শ্যাম জাতকে (জাতক নং-৫৪০) ভদ্রাকপিলানী ভিক্ষুণীদের নাম পাওয়া যায়। ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অবদান ছিল মহাপ্রজাপ্রতিগৌতমী। তিনি শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের স্ত্রী এছাড়া শ্রেষ্ঠী কন্যা উৎপলবর্ণা, অনোপমা, সুমেধা, বাগ্বিনী এরা সবাই সাধনাবলে অর্হত্বফল লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে উৎপলবর্ণা তথাগত ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ঋষিপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত হন। বিম্বিসারের পত্নী, ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টি লাভে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন। এরকম অনেক ভিক্ষুণী যাঁরা সংসারের মায়া ছিন্ন করে অমৃতময় নির্বাণের পথে এগিয়ে আসেন। স্বামী পরিত্যক্তা, বাল্যবিবাহ, পুত্র-কন্যাহারা ভিক্ষুণীদের মধ্যে অনেকে প্রব্রজিত হয়ে জীবনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। সংসারের অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পটাচারা, কৃশাগৌতমী, আম্রপালী, ইসিদাসী, বিমলা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অনেকে যাঁরা গৃহ জীবনে ছিলেন অবহেলিত, নির্যাতিত কিন্তু ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার পর তাঁদের দুঃখ দুর্দশা অনেকাংশে কমে যায় এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র, শ্রেণি, স্তর শ্রেণি হতে নারীরা ভিক্ষুণীসংঘে যোগদান করেছিল। এখানে সদ্বংশজাত ও উচ্চ বংশজাত রাজ পরিবারের এবং ধনী ব্যক্তিদের স্ত্রী কন্যারও সমাবেশ ঘটেছিল। বিবাহিত, বিধবা, ক্রীতদাসী, বারবণিতারাও ছিলেন। বলা যায় সমাজের সর্বস্তরের কম বেশি নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী রূপে মুক্তিমার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। সে সময়ে তারা দেশ-বিদেশ ও সমুদ্রপথে পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি করতো। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পকর্মের দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতো । এভাবে ধীরে ধীরে তারা অর্থনৈতিকভাবে বিত্তশালী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। প্রাচীন ভারতবর্ষের এমন কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরীর নাম পাওয়া যায় যেমন: রাজগৃহ, বারাণসী, বৈশালী, শ্রাবস্তী ইত্যাদি নগরগুলো নানা কারণে ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। সে সময়ে ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীদেরকে সাধারণত শ্রেষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ তারাই নগরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে এবং জাতক সাহিত্যে সেই সময়কার বহু শ্রেষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চুল্লশ্রেষ্ঠী জাতকে (জাতক নং-৪) চুল্লশ্রেষ্ঠী উপাধি প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ঐশ্বর্যশালী কিংবা সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ীদেরকে শ্রেষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হতো। বৌদ্ধ সাহিত্যের এবং জাতক সাহিত্যে অনেক সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিবর্গ ছিল তন্মধ্যে অনাথপিণ্ডিক ছিলেন অন্যতম। অনাথপিণ্ডিক যিনি ভগবান বুদ্ধকে বিশাল জেতবন বিহার দান করেছিলেন। এটি বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। প্রাচীনকালে গৃহপতি একটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে যার অর্থ হলো পরিবার প্রধান। সাধারণত যার সম্মানের ভিত্তি ছিল উচ্চকুলে জন্ম এবং সম্পদের পরিমাপ।[৪১]

বর্তমান সময়ের মতো প্রাচীন নগরগুলোর অবকাঠামো সেসব ছিল না। প্রাচীন রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বৈশালীর মতো নগরগুলো ছিল স্ফীত, জনবহুল ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিল উন্নত। তাদের এ বিলাসবহুল জীবনযাত্রার একমাত্র মাধ্যমই ছিল সমৃদ্ধি। অনেকেরই একাধিক বসতবাড়ী থাকতো। এমনকি বহু মানুষের একাধিক ব্যক্তিগত প্রাসাদও ছিল। প্রাচীনকালে ধনী লোকেরা সপ্তভূমির প্রাসাদে বাস করতেন। ভদ্রশাল জাতকে[৪২] উল্লেখ আছে প্রাচীন ভারতে বহু মূল্যবান ও বহুসম্পদযুক্ত প্রাসাদ ছিল। এছাড়া এদের ব্যক্তিগত সম্পদও ছিল প্রচুর। প্রয়োজনমত তাদের শস্যাগারগুলো পরিপূর্ণ রাখতেন অনাবৃষ্টি, খরা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ে। মিলিন্দ প্রশ্ন[৪৩] হতে জানা যায় সে সময়কার ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মহাশাল, গৃহপতি এবং সামন্তরাজা ও শাসকদের প্রচুর অর্থবিত্ত ও খাদ্যশস্য মজুত থাকতো। মূলত তখনকার দিনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ ছিলেন বণিকেরা। এই কোটিপতি

Dhaka University Institutional Repository

বণিক প্রধানরা নগরেই বসবাস করতেন। তারা এতটাই বেশি বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন সেজন্যই তাঁরা শ্রেষ্ঠী পদে উপাধি লাভ করেছিলেন। যেমন রাজগৃহ নগরীর প্রধান ছিলেন রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী। ভদ্দবতী নগরের প্রধান ছিলেন ভদ্দবতী শ্রেষ্ঠী। উভয়েই নিজ নিজ নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন।

জাতক সাহিত্যে অনেক জাতকে এসব শ্রেষ্ঠীদের নাম পাওয়া যায়। নগর জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসংখ্য শিল্প শ্রমিকের আবির্ভাব দেখা যায়। অনেকে নগরে অবস্থান করে নগর জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছিল। নগরগুলো ছিল বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও হস্তশিল্পের কেন্দ্রস্থল। এসব শিল্প ছিল নানা প্রকার যেমন: ১. বস্ত্র, :বস্ত্রের মধ্যে কৌসেয় বস্ত্র, কাপাস বস্ত্র, ক্ষৌম বস্ত্র ইত্যাদি ২. কাঠের রকমারী জিনিস ৩. ধাতব পদার্থ যেমন: লৌহ, তামা, সীসা, স্বর্ণালংকার ৪. পাথরে জিনিস ৫. কাঠের দ্রব্য ৬. অস্থি ও হাতির দাঁতের জিনিস ও দ্রবাদি ৭. প্রসাধনি ৮. তেল ও তরল পদার্থ ৯.চর্ম ও চর্মজাতীয় তৈরি সামগ্রী। ১০. মাটির দ্রব্য যেমন: পাত্র, ফলক প্রভৃতি ও ইট ১১. অন্যান্য নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যেমন: মালা, নল, সংগীত সরঞ্জাম, সুচি, রং কিংবা চিত্রকর্মের দ্রব্য সামগ্রী ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীনকাল থেকেই বারাণসী নগর কাসি কাপড় ও চন্দন কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।[৪৪] এছাড়া মিলিন্দ[৪৫] প্রশ্ন থেকে জানা যায় সাগল নগরও বস্ত্রের জন্য বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। মিলিন্দ প্রশ্ন থেকে আরো জানা যায় কাশী, কোটুম্বর আদি স্থানে নানা প্রকার বস্ত্রের বড় বড় দোকান ছিল।

তখনকার দিনে কৃষি উৎপাদিত তুলা ছিল ব্যবহার্য দ্রব্য। তুলা থেকে নানা প্রকারের বিলাস দ্রব্য তৈরি হতো। বারাণসীতে তৈরি কাপড়গুলো বিভিন্ন স্থানে ও নগরে চালান দেওয়া হতো এবং সেসব অঞ্চল থেকে আবার প্রয়োজনমত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আমদানী করা হতো। এসব গ্রাম পেশা ও কারিগরি শিল্পে এতই উন্নত ছিল যা নগরগুলোর সমতুল্য। গ্রামে লবণ প্রস্তুত ও মাটির জিনিস তৈরি করা হতো। নগরে এগুলোর চাহিদা ছিল প্রচুর। শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শিল্প পরিষদগুলো নিয়মিত শিল্পশ্রম চালু রাখতো।[৪৬] সে সময় বণিকেরা শিল্পজাত দ্রব্য হিসেবে নানা প্রকার কৃষি পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের উৎস বলে মনে করতেন। মিলিন্দ প্রশ্ন থেকে জানা যায় [৪৭] উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল বিভিন্ন ফল, বিভিন্ন সুগন্ধি বস্তু, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো অনেক রকম গাছের শিকড় ও ছাল, অমৃত, নানা প্রকার রত্ন সামগ্রী, রূপা, চাঁদি,পাথর, শাক-সবজি, আখ, ধান, গম, পাট, সরিষা, ঔষধ,

Dhaka University Institutional Repository

মলম, দন্তমাজন প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য পালি গ্রন্থ এবং জাতক সাহিত্য থেকে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়।

বুদ্ধযুগে নগর জীবনে শ্রমবাজারে একটি বিশাল পটভূমিকা পরিদৃষ্ট হয়। নানা পেশা ও শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বৈষম্য এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিভাজনও পরিলক্ষিত বুদ্ধের কর্মবাদে শ্রমজীবি পেশাকে কোনভাবেই মূল্যায়ন করা যায় না। বুদ্ধ এভাবে কর্মফল তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের জীবনে নামিয়ে এনেছিলেন, যার ফলে কোন ক্ষুদ্র, দরিদ্র রুগ্ন ও নিচু শ্রমজীবিদের জন্য একটু আশার আলো। অধিক পরিশ্রমে যে ধন সম্পত্তি লাভ করা যায় এ বিষয়টি এখানে প্রযোজ্য হয়। এখানে কর্মমূলধনই বড়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে আরেকটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয় যে, সকল পেশাজীবি মানুষদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে উৎসাহ প্রদান করে যেখানে আমরা স্ব স্ব পেশাজীবি সকলেই যেন স্বাবলম্বী হতে পারি। এতে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে স্বাবলম্বী নয়, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা নগরজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামগ্রিকতার স্বয়ংসম্পূর্ণতা চলে আসে। শ্রেণি বৈষম্যহীন কর্ম সকলকে আত্মকর্মে নিবেদিত হওয়ার উৎসাহ সৃষ্টি করে। ফলে আর কোন কর্মে কোন প্রকার আলস্যতা থাকে না। স্ব স্ব জীবনের সকল অবস্থায় অর্থ সম্পদ ও বিত্ত বৈভবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে নাগরিক জীবনের নানা ধরনের দূর্নীতি, অপরাধ যেমন-চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, ব্যভিচার ও কুকর্ম দূরীভূত হয়। একটি সুসমৃদ্ধ অপরাধহীন নাগরিক জীবন তৈরি হয়। এতে নগরজীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধ আসে।[৪৮]

প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে লোহার ব্যবহার। লোহার ব্যবহার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। খননকার্যের ফলে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় লোহার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন থেকেই লোহার তৈরি লাঙ্গলের ফলার ব্যবহার শুরু হয়। এই লাঙ্গলের ফলা দিয়ে কৃষিতে নতুন পদ্ধতি চালুর ফলে নতুন ফসল উৎপাদন করা হতো, যার ফলে কৃষকেরা দ্রুত ধনী বা বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। [৪৯] এই লোহার লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় লৌহাস্ত্রের সাহায্যে জঙ্গল পরিস্কার করে নিত্য নতুন এলাকায় কৃষির সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছিল। [৫০] এই লৌহস্ত্রের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন ছিল। জাতক সাহিত্যে শকুনঘ্নী জাতকে [৫১] লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই লোহার ব্যবহারও বর্তমান কালের মতো প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে।

প্রাচীনকালে জাতক সাহিত্যে থেকে জানা যায় বুদ্ধের সময়কালে কৃষিকাজের প্রচলন ছিল এবং কৃষিকাজের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। প্রাচীনকালে কৃষি এবং পশুচারণের উপর নির্ভরশীল মিশ্র অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছিল। পশু পালনের মধ্যে গরুই ছিল প্রধান। যমুনা নদীর উপত্যকা গো সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঋক-বৈদিক আর্যদের জীবন চর্যায় গরু একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। সে সময়ে সাধারণ মানুষ গো সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতো । যারা যুদ্ধ করতো , তারা লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে এই সম্পদ লাভ করতে চাইত। তবু পুরোহিতগণকে গো-দানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হতো। ঋগ্বেদে গাভিষ্টি শব্দটি পাওয়া যায়। এর অর্থ গরুর অনুসন্ধান।[৫২] এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, চুরি করা গরু পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন করে গো সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা হতো। গরুর মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গরুকে চিহ্নিত করা হতো। শুধুমাত্র কৃষিকাজের অথবা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের হিসাবে নয়। মূল্যের একক এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গরুকে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া ব্যক্তি বিশেষের সম্পদ পরিমাপের মাপ কাঠি ছিল গরু। [৫৩]

বুদ্ধ পূর্ব যুগে যাগ-যজ্ঞে পশুবলীর কারণে পশু-পাখির হ্রাস হওয়ায় কৃষিকাজের অনেক ব্যঘাত ঘটেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে পশু হত্যাকে নিরুৎসাহিত করাতে কৃষি অর্থনীতির লক্ষণীয় বিকাশ সাধিত হয়েছিল। [৫৪] প্রকৃত অর্থে কৃষিকাজ ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। কৃষককে 'কৃষ্টি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ডঃ রায় চৌধুরী কৃষিকাজ সম্পর্কে বলেন, উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান এবং যবই ছিল প্রধান। [৫৫] এছাড়াও নানা প্রকারের বাদাম, ফল ও শাক সবজির চাষ হতো। জমিতে সার প্রয়োগ, জল সেচের এবং অতিরিক্ত জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা হতো।[৫৬] এই কৃষিকাজের ব্যবস্থা বা প্রচলনটা প্রাচীনকাল থেকেই সম্প্রসারিত হয়েছে। উল্লেখিত পানীয় জাতকে [৫৭] কৃষি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে সেই অর্থনীতির সমৃদ্ধির সময়ে নগর জীবনে ও জীবন জীবিকায় গণিকা বৃত্তি পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর সমাজ পরিত্যক্ত রমণীরাই এই পেশাতে লিপ্ত থাকতো। জাতক সাহিত্য হতেও গণিকা বৃত্তির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখিত তর্কারিত জাতক [৫৮] থেকে জানা যায় বারাণসীতে কালী নাম্নী এক গণিকা বাস করতো । অন্যদিকে স্মৃতিশাস্ত্রে গণিকা বৃত্তিকে খুবই

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দনীয় চোখে দেখা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে গণিকাদেরকে চোরের সমতুল্য করা হয়েছে। গৌতম বলেছেন যে, গণিকা হত্যা কোন পাপ হয় না। গণিকাদের সম্পর্কে ধর্মীয় মনোভাবের সাথে সাধারণের মনোভাবের কোন মিল পরিলক্ষিত হয় না। [৫৯]

পালি সাহিত্যে তথাগত বুদ্ধের সময় গণিকা আম্রপালী বৈশালী নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনেছিল। পরম রূপবতী এই মহিলা অর্থীপ্রত্যার্থী বিশেষের কাছ থেকে প্রতি রাতের জন্যে পঞ্চাশ মুদ্রা গ্রহণে অভিসার গমন করতো। এছাড়া আরো উল্লেখযোগ্য হলো বুদ্ধ ও বুদ্ধ শিষ্যদের অমৃতময় বাণী শুনে বৈশালীর আম্রপালী, শালবতী, পাটলিপুত্ত নগরের শোভনী, বিন্দুমতি যারা পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী ধর্ম গ্রহণ করে রূপ ও যৌবনের অসারতা প্রমানে সক্ষম হয়েছিল। তথাগত বুদ্ধ কখনো মিথ্যা কামাচার বা গণিকাবৃত্তি অনুমোদন করেন নাই। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীসংঘের মধ্যে কামাচার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তবে এই পেশাটি ঘৃণার হলেও গণিকাদের তিনি অস্পৃশ্য বা ঘৃণার চোখে দেখেননি। বুদ্ধের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি মানবতার এক সর্বোচ্চ মূল্যায়ন। অনেকে বলেছেন এই পেশা নগর জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক ছিল।[৬০] তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিতে এটিকে কখনো ইহ-জাগতিক ও পারলৌকিক সদ্ বা উত্তম পেশা বলা যাবে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বণিকেরা শহরের নানা জায়গা ভ্রমণ করে দ্রব্য বিক্রয় করতেন। সেরি বাণিজ্য জাতকে [৬১] দেখা যায় সেরি রাজ্যের দু'জন বণিক অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতেন। সেই দু'জন বণিক বিভিন্ন রাস্তায় ফেরি করে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে বেড়াতেন। এছাড়াও গাধার পিঠে পণ্য সামগ্রী বোঝাই করেও নগরের বিভিন্ন স্থানে জিনিস বিক্রয় হতো। অপণ্ণক জাতকে [৬২] উল্লেখ আছে বণিকদের শকট সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। এবং অপণ্ণক জাতক থেকে জানা যায়, সে সময়কার দিনে বণিকেরা শকটে মাল বোঝাই করে কখনও পূর্বদিকে, কখনও পশ্চিম দিকে কখনও বা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পণ্য দ্রব্য নিয়ে নগরের দূরবর্তী স্থানে বাণিজ্য করতে যেতেন । বণ্ণুপথ জাতক [৬৩] থেকে জানা যায় যে, শ্রাবস্তী নগরের দু'জন বণিক পঞ্চশত শকট পণ্যদ্রব্য দিয়ে পূর্ব দেশ থেকে ঘুরে পুনরায় শ্রাবস্তী ফিরে আসেন। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থ [৬৪] হতেও পঞ্চশত শকটের উল্লেখ পাওয়া যায়। বণিকরা শুধুমাত্র নগরেই প্রবেশ করতেন না নগরের বাইরেও প্রবেশ করে পৌর কর্তৃপক্ষকে শুল্ক দিতেন। এই শুল্ক ব্যবসা ছিল নগরে অর্থনৈতিক আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পালি সাহিত্য থেকে জানা যায় সম্রাট অশোক

Dhaka University Institutional Repository

আয়কর বা শুল্ককর হিসেবে পাটলিপুত্ত নগরের চারপাশ থেকে প্রতিদিন চারলক্ষ মুদ্রা আয় করতেন।[৬৫]

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ার জন্য স্থলপথে ও জলপথের সংযোগ ছিল। এই দুই পথে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ছিল। ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি সাধন হয়েছিল। সে সময় ভরুকচ্ছ ছিল শ্রেষ্ঠ এক সামুদ্রিক বন্দর নগরী। ভরুকচ্ছ থেকে বণিকেরা সমুদ্র পথে বিভিন্ন দেশে গমন করতেন। বণ্ণুপথ জাতকে (জাতক নং-২) উল্লেখ আছে বণিকেরা সমুদ্র পথে এবং মরুপথে চলার সময় নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতেন এবং তাদের সঙ্গে একজন স্থল নিয়ামক রাখতেন। এছাড়া জাতক সাহিত্য থেকে আরো জানা যায় সেই সময়ে বক, মৎস, মর্কট,মৃগ, শিকার বর্ত্তক, হংস, ময়ুর এসব পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং এসব পশুপাখিকে নানা কাজে ব্যবহার করতেন। বণিকেরা যখন সমুদ্র পথে যাত্রা করতেন এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র পথে গমন করতেন তখন তারা নানা ধরনের পশুপাখিদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বিশেষ করে সমুদ্র যাত্রাকালে বণিকেরা তীরদর্শী কাককে ব্যবহার করতেন।

এছাড়াও বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পোত-সংযোগ দেশ বিদেশে আসা-যাওয়া করতো । সুপারগ জাতকে [৬৬] ভৃগুকচ্ছ পট্টন (বন্দর) নামে একটি সমুদ্র বন্দর ছিল। পোতগুলো প্রভৃতি পট্টন হতে পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করতো এবং বিভিন্ন স্থানে নোঙর করে পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রবাল সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসত। বারাণসী চম্পা এসব গঙ্গাতীরবর্তী নগরের সমুদ্র বণিকেরা পোতারোহণে গঙ্গানদী দিয়ে সাগরে অবতরণ করতো । প্রত্যেক পোতে একজন নিয়ামক (Pital) থাকতো। এভাবে প্রাচীন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ার জন্য জল পথ, স্থল পথ এবং গুরুত্বপুর্ণ রাস্তাও ব্যবহৃত হতো। [৬৭] সমুদ্রপথে দিনের জাহাজ স্থলভূমির দৃশ্য বহির্ভূত হলে ঐ সব তীরদর্শী কাকগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হতো। কাকগুলো স্থলভূমির দৃশ্য দেখলেই সেদিকেই উড়ে যেত। এভাবে নাবিকেরা রাত্রিবেলাই নক্ষত্র এবং দিনের বেলায় তীরদর্শী কাককে ব্যবহার করেই সমুদ্র পথে গমন যাতায়াত করতেন। আবার বণিকেরা ব্যবসা ও যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে হস্তী, গাধা, অশ্ব প্রভৃতি শকট যান ব্যবহার করতো ।

বৌদ্ধ মতে ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা দ্রব্য-পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হলেও বৌদ্ধদের কাছে পাঁচটি বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল। সেই পাঁচটি বাণিজ্য হলো- অস্ত্র, বিষ, মাংস, মানুষ এবং নেশাদ্রব্য। তখনকার সময়

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যকর্মে অর্থ লেনদেন সূত্রে অর্থলগ্নী করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় বিধানে এসব জীবন-জীবিকাকে উৎসাহিত করা হয় নি। বৌদ্ধ সাহিত্যে সুদ ও ঋণ বিষয়ক অর্থ লেনদেনকে সৎ জীবিকা হিসেবে দেখা হয় নি। তাই বৌদ্ধ বিনয়ে দেখা যায় ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিরা উপম্পদা লাভ করতে পারেনা এবং সংঘে প্রবেশ করতে পারেনা। ঋণ পরিশোধপূর্বক বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ নিয়ম দেখা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে সুদের বিনিময়ে ঋণ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। উল্লেখিত রোহন্ত মৃগ জাতকে [৬৮] দেখা যায় ঋণদানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো ।

শিক্ষা ব্যবস্থা

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা। শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া মানব জীবন অচল। আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব সমাজ নানামূখী শিক্ষা ও জ্ঞান সাধনায় ব্রতী রয়েছেন। তাই শিক্ষার মান বেড়েই চলেছে দ্রুত গতিতে। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা কখনো থেমে থাকে নি। সবকিছু থেমে থাকলেও জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে কখনো থেমে থাকেনি। এ উপমহাদেশে তথা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই সুনিয়ন্ত্রিত, জীবন ঘনিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। তখনকার সময় দুই প্রকার শিক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন: প্রাক্ বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ। এই দুই প্রকার শিক্ষা পদ্ধতিই ছিল নগরকেন্দ্রিক। তক্ষশীলা ও বারাণসী ছিল মূলত প্রাক্ বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতির কেন্দ্রস্থল ।

মহাবগ্গ ও জাতক অনুসারে তক্ষশীলা ছিল প্রাক্ বৌদ্ধ যুগেরই এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রিক নগরী। বিদ্যা শিক্ষার জন্য এই তক্ষশীলায় দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীরা আগমন করতো। তার উল্লেখ জাতক সাহিত্যের বিভিন্ন জাতকে পেয়েছি। শুধুমাত্র তক্ষশীলা নয় বারাণসীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারাণসীও প্রাক্ বৌদ্ধ যুগের একটি অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রিক নগরী ছিল। ভগবান বুদ্ধের সময় বারাণসী নগরটি ছিল বিদ্যা শিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। এই নগর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী ঋষিপতন মৃগদাবে ভগবান বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদেরকে প্রথম ধর্মোপদেশ দান করেন।

তক্ষশীলা শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল না, এতে অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী শিক্ষক ছিলেন যাঁরা অনেক দক্ষতা অর্জন করেই শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। এজন্য নগরে তাঁরা সুনাম ও সম্মান পেতেন অনেক বেশি। শিক্ষকগণ শিক্ষার উপরই দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের আদর্শ ছিল একমাত্র শিক্ষা। এজন্য শিক্ষকদের প্রতি সবার ভালবাসা ও সুখ্যাতি ছিল প্রচুর। পূর্বেই উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেছি এ শিক্ষকগণ শুধুমাত্র বারাণসী ও তক্ষশীলার শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দান করতেন না বরং বিভিন্ন রাজ্য এবং দেশ-বিদেশ থেকে আসা অসংখ্য শিক্ষার্থীদেরকেও শিক্ষা দান করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তক্ষশীলায় দেশ বিদেশের যেসব শিক্ষার্থীগণ আসতেন তাঁরা শুধু ত্রিবেদ শিক্ষাই গ্রহণ করতেন না। এর পাশাপাশি জ্ঞানের আঠারটি শাখায় শিক্ষাদান করা হতো। শিক্ষকগণ প্রথমদিকে লিখন, মুদ্রা, গণনা, মন্ত্র, শ্রুতি, সম্মূর্তি (স্মৃতি) প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করতেন। পরে নানা প্রকারের যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দান করা হতো। যুদ্ধবিদ্যার মধ্যে ছিল ধনু, অশ্ব, রস, অসি চালনা, সৈন্য সঞ্চালন প্রভৃতি। [৬৯] পালি সাহিত্যে এবং মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে [৭০] মুদ্রা গণনা, মন্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা আরো প্রসারিত হয়। "মিলিন্দ প্রশ্ন" [৭১] নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, গ্রীকরাজ মিলিন্দের বিদ্যাবত্তার বিষয়ের সাথে আরো ঊনিশ প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে সংখ্যা, যোগ, ন্যায়, চিকিৎসা, অথর্ববেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, যাদুবিদ্যা, হেতু, ছন্দ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমস্ত বিষয় থেকে সেকালে রাজকুমারদের শিক্ষণীয় আচার ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া যায়। তখনকার সময়ে ধনুর্বিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা ছিল যেখানে রাজকুমার তথা রাজসৈনিকদেরকে রাজার সামনে ধনুর্বিদ্যা চালনা শিক্ষা দিতেন। উল্লেখিত খুল্লধনুর্গ্রন্থ জাতকে [৭২] দেখা যায় ব্রাহ্মণ কুমারেরা তক্ষশীলায় গিয়ে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করতো। শুধুমাত্র ধনুর্বিদ্যা নয় গজবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো উল্লেখিত সংগ্রামাবচর জাতকে [৭৩] গজ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে মঙ্গলহস্তীকে যত্নসহকারে শিক্ষাদান করা হতো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। যুদ্ধবিদ্যার মতো অন্যান্য শাখাগুলোতে চিকিৎসা ও অর্থকারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও শিক্ষা প্রদান করা হতো। শল্য চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে [৭৪] উল্লেখ পাওয়া যায় কিভাবে অস্ত্র ধরতে হয়, কিভাবে ছেদন করতে হয়, কি উপায়ে চিহ্ন করতে হয় ও কি উপায়ে অস্ত্র প্রবেশ ও বাহির করতে হয় সমস্ত বিষয়ে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করতো।

ভারতবর্ষে প্রাক্ বৌদ্ধ শিক্ষায় দেখা যেত যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশের শিক্ষার্থীরাই শুধুমাত্র ছাত্র হিসেবে পাঠশালায় গমন করতো। ত্রিবেদের জ্ঞানার্জন ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ তখন একমাত্র ত্রিবেদই ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি। উল্লেখ্য যে, ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন পিপ্পোল ভারদ্বাজ নামক এক ব্যক্তি ত্রিবেদে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এজন্যেই ব্রাহ্মণ

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের শিক্ষা প্রদানের ভার দায়িত্ব তাঁর উপরই অধিক অর্পণ হতো। অপর একজন তিস্য ছিলেন যিনি বেদ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। উল্লেখিত মূলপর্য্যায় জাতকে [৭৫] বেদ শিক্ষার উল্লেখ আছে। সেহেতুে ছাত্রদেরকে বেদ মন্ত্র শেখানোর দায়-দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। আরো উল্লেখ আছে যে, প্রতিদিন তিনি পাঁচশত ছাত্রদের বেদ মন্ত্র শেখাতেন। অনভিরতি জাতকে [৭৬] দেখা যায় তখনকার শিক্ষাদান কেন্দ্রে আচার্য্যগণেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুমারদেরকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধ সমকালীন প্রাক বৌদ্ধ শিক্ষায় ত্রিবেদ শিক্ষা অপরিহার্য হলেও বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচারিত হওয়ার পর পরই বিভিন্ন সংঘারাম, বিহার, কিংবা পাঠশালাতেও ত্রিপিটকের উপাধি প্রদানের নিয়ম চালু হয়। তখনকার সময়ে বৌদ্ধ শিক্ষাগারগুলোর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত মনোরম, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল। এখানে যেসব ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বসবাস করতেন তাঁরা ছিলেন শীল-বিনয় এবং ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞায় নিবেদিত। তাঁরা নিজ নিজ বিহারে নিজ নিজ দায়িত্বে লোকালয়ে কিংবা লোকালয়ের বাইরের শিক্ষার্থীদেরকে অবৈতনিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতেন। সে সময়ে বিহার বা সংঘারাম এবং উচ্চ শিক্ষা ও শিল্পচর্চার কেন্দ্রেও সর্বপ্রথম অবৈতনিক শিক্ষা লাভের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধের সময়কালীন থেকেই নালন্দা মহাবিহার ছিল প্রাচীন ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা পরবর্তীকালে অন্যতম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নামে আখ্যায়িত হয়। এই নালন্দা মহাবিহার প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করা হতো এবং তাঁদের লেখাপড়া ও থাকা খাওয়ার যাবতীয় খরচ ব্যয় হতো একশত গ্রামের রাজস্ব থেকে। তখনকার সময়ে শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর অবস্থান ছিল বড় বড় নগরের আশে পাশে। শিশুরা সাধারণত বাসায় বসে কিংবা বাড়ীর আশেপাশের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতো। থের গাথায় উল্লেখ আছে যে, নগরের সন্নিকটে সভিয় নামক এক ব্যক্তির একটি শিক্ষালয় ছিল। সেখানে তিনি শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করতেন। বিভিন্ন জাতক সাহিত্য থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে ধনী লোকেরা তাদের শিশু সন্তানের শিক্ষাদানের জন্য গৃহ শিক্ষক রাখতেন। কিন্তু গরীবদের পক্ষে গৃহ শিক্ষক রাখা সম্ভব না হলেও, সন্তানদেরকে যে কোনো উপায়ে শিক্ষা দিতেন। [৭৭] "কটাহক জাতক" [৭৮] হতে জানা যায় ধনী লোকের শিশু যখন পাঠশালায় লেখা-পড়া করতে যেত, দাসীর পুত্রও তখন ফলক বহন করে অনুগমন করতো এবং দাসীর পুত্রও নিজে নিজে লেখা শিখতো। মিলিন্দ প্রশ্ন [৭৯] নামক গ্রন্থ হতে জানা যায় কজঙ্গল নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের সোনুত্তর ব্রাহ্মণের পুত্র নাগসেনকে সাত বছর বয়সেই বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বিদ্যাচর্চার আশ্রম, সংঘারাম, বিহার কিংবা বিদ্যালয়গুলোর নিয়মশৃঙ্খলা ছিল অত্যন্ত কঠোর। বিনয় বর্হিভুত নিয়মনীতি এবং আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদানের বিধান ছিল। তখনকার দিনে শাস্তির হাতিয়ার ছিল বেত বা বাঁশের কঞ্চি। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে শিক্ষকরা ছাত্রদের পিঠে আঘাত করে শাস্তি দিতো। শাস্তি প্রদানের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য বিভাজিত হতো না। অপরাধ অনুসারে শাস্তি প্রদান করা হতো। এরকম কঠোর নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই শিক্ষকরা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতের মাধ্যমেই অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফেলতো। গরীব ছাত্রদের বিনা বেতনে লেখাপড়া বা শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ ছিল। এক্ষেত্রে গরীবেরা 'ধম্মান্তেবাসিক' নামে আখ্যায়িত করা হতো। তারা দিনে গুরুর সর্ব প্রকার কাজ ও সেবা করতো এবং রাতে পাঠ গ্রহণ করতো। এছাড়া যারা পারিশ্রমিক দিত বা দিতে সক্ষম ছিল, এরকম ছাত্ররা শিক্ষকের কাছে সন্তানের মতো লালিত পালিত হতো এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করতো। তখনকার দিনে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে অন্তত পাঁচশত ছাত্র থাকতো। তখনকার দিনে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল অমায়িক এবং মধুর। একে অপরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের আন্তরিকতা উপলব্ধি করা যেত। ছাত্ররা শিক্ষকদের দেখা মাত্রই তারা সম্মান দেখাতো ও আনুগত্য প্রকাশ করতো। [৮০]

প্রাচীনকালে জাতক সাহিত্যে দেখা যায় ছাত্ররা বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিল। অয়ঃকুট জাতকে [৮১] দেখা যায় সে সময়কার বিহারগুলো শিল্পচর্চায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এছাড়া নগরগুলোতে যেসব পরিব্রাজক বসবাস করতেন, অর্থাৎ জাতকে তাদেরকে পৌরোহিত বলা হয়। উল্লেখিত শীলমীমাংসা জাতকেও [৮২] পৌরোহিতের নাম পাওয়া যায়। তারা নানা প্রকার শিক্ষার পাশাপাশি তাত্ত্বিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতেন। উল্লেখিত অরক জাতকে [৮৩] তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে বহু উপদেশ পাওয়া যায়। অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক শিক্ষাও দান করতো। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তখনকার সময়ের শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মিলিন্দ প্রশ্ন [৮৪] থেকে অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি জ্যোতিষ বিদ্যারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রাক্ বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় নগর জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুযোগ সুবিধা পেয়ে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধযুগে নগরবাসীদের বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নগর জীবনে সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং কোন প্রকার ভেদাভেদ ও বৈষম্য ছিল না। তখনকার শিক্ষকেরা নগরবাসীকে খুবই আন্তরিক ও ভালবাসা দিয়ে শিক্ষা দান করতেন। ফলে বিহারগুলোতে ছোট, বড়, ধনী দরিদ্র সব ধরনের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র' পুরুষরাই শিক্ষা লাভ করতেন তা নয়, নারীরা ও জ্ঞান সাধনায় নিজেদেরকে অগ্রগামী করেছিল। মূলত ভগবান বুদ্ধই নারীদেরকে প্রথম শিক্ষার সেই সুযোগ দান করেছিলেন এবং পরে তাঁরা ধীরে ধীরে পুরুষদের শিক্ষার সমপর্যায়ে চলে আসে। তাই এই শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল তা নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশ তথা এশিয়ার বৌদ্ধ দেশসমূহে এই শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা এবং ধর্মের প্রভাবে সেই সব দেশে পুরুষ ও মহিলারা ধর্মচর্চা, বিদ্যাচর্চা ও নানামূখী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমানভাবে উন্নতি ও ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। [৮৫]

রাষ্টীয় অবস্থা

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থাৎ বুদ্ধের সময়কালে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজ প্রথাসিদ্ধ। বৌদ্ধ ইতিহাসে যে তথ্য পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায়, ভারতবর্ষের প্রথম রাজা ছিলেন রাজা মহাসম্মত। তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং তিনি গণতান্ত্রিক রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনামলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থার বেশ প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও অঞ্চল ভিত্তিক বহু রাজার আবির্ভাব ঘটে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা হতো। বুদ্ধ সময়কালীন প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোলটি গণরাজ্যে বা জনপদে বিভক্ত ছিল। এগুলোর অধিকাংশ ছিল গণশাসনমূলক বা গোষ্ঠীভিত্তিক। বৌদ্ধ ইতিহাস ও পিটকের বিভিন্ন স্থানে জনপদ বা গণরাজ্যগুলোর বিস্তৃতি ও পরিধি ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ রাজ্যগুলোর বিস্তৃতি ও আয়তন সীমিত হলেও এগুলোর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীকৃত। রাষ্ট্রের অধীনে শহর ও গ্রামগুলোর শাসনের জন্য শাসক, উপশাসক ছিলেন। আবার কোন কোন রাজ্যে অঙ্গরাজ্যও ছিল। মূলত অঙ্গরাজ্য বলতে রাজ্যের অধীনস্থ শহর ও গ্রামকে বোঝায়। যাঁরা এসব গ্রাম ও শহরের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন তাঁদেরকে রাজা বলা হতো ।

রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর মধ্যে দেখা গেছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত করা হতো। ত্রিপিটকের অর্ন্তগত বিনয় পিটকের মহাবর্গ গ্রন্থে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচটি এলাকা নিয়ে বিভাজিত করা হয়েছে। যেমন: মধ্যদেশ, উত্তরাপথ, অপরান্ত, প্রাচ্য ও দক্ষিণাপথ। এগুলো

Dhaka University Institutional Repository

আবার ১৬টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যথা:-১.অঙ্গ ২.মগধ ৩.কাশী ৪.কোসল ৫.বজ্জী ৬.মল্ল ৭.চেতী ৮.বংস ৯. কুরু ১০.পাঞ্চাল ১১.মচ্ছ ১২.সুরসেন ১৩.অস্সক ১৪.অবন্তী ১৫.গান্ধার ১৬.কম্বোজ। এসব রাজ্য বা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেয়া হলো।

অঙ্গ

এর রাজধানী ছিল চম্পানগরী বা চম্পানগর। জানা য়ায় এই নগরে গণমূলক শাসন পদ্ধতি চালু ছিল। গৌতম বুদ্ধ এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, মজ্ঝিম নিকায়ের মহা অশ্বপুর এবং ক্ষুদ্র অশ্বপুর এ দু'টি সূত্র ভগবান বুদ্ধ অশ্বপুর নামক স্থানে অবস্থানকালে উপদেশনা করেছিলেন। এখানে শৈল তপস্বী প্রায় তিনশত শিষ্যসহ নিয়ে ভগবান বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মগধরাজ এ রাজ্যের উপর আঘাত হেনেছিল এবং যুদ্ধে পরাজিত করে। এজন্যই পরবর্তীকালে এর নাম অঙ্গ মগধ। তখন থেকেই এ রাজ্য স্বাধীন সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। মগধের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল এবং পরবর্তীতে মগধের নিয়ন্ত্রণাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রচলন হয়েছিল এবং রাজধানীর নামানুসারে অঙ্গ রাজ্যটি চম্পানগর নামে পরিচিতি লাভ করে। [৮৬] এছাড়া চাম্পেয় জাতকে [৮৭] এই রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। উল্লেখিত জাতকে আরো জানা যায় অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে চম্পা নদীর অবস্থান ছিল এবং এই নদীতে নাগগণ বসবাস করতেন। উল্লেখিত জাতক থেকে জানা যায় নাগরাজের নাম ছিল চাম্পেয়। সেই অনুসারে রাজধানীর নাম হয়েছে চম্পানগরী।

মগধ

প্রাচীনকাল থেকেই মগধ ভারতবর্ষে তথা ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে প্রধান একটি রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা নিয়ে প্রাচীন রাজ্য গঠিত। মগধের মধ্যে দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এ রাজ্যের ভূমি ছিল খুবই উর্বর এবং জনগণ সাহসী ও পরিশ্রমী। [৮৮] মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী, উদার ও নীতিপরায়ণ। রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্ম ও বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী ছিলেন। এই রাজ্যটি বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের তিলয়্যা নামক স্টেশনের নিকটবর্তী। বেভার, পাণ্ডব, বেপুল, গিজঝকুট ও ইসিগিল এই পাঁচ পর্বত দ্বারা রাজ্যগৃহ পরিবেষ্টিত ছিল। [৮৯] পরবর্তীতে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে নিয়ে যান। ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এই মগধকে বিম্বিসার পুরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই মগধকে কেন্দ্র করে একসময় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেখানে

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা,শিক্ষা,সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত ইতিহাস বিদ্যমান ছিল। তাই বুদ্ধ কিংবা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে মগধ রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। [৯০] এছাড়া চাম্পেয় জাতকে [৯১] মগধ রাজ্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং কিছু কিছু সময় মগধরাজ অঙ্গরাজ্যকে অধিকার করতো আবার কিছু কিছু সময় অঙ্গ রাজ মগধরাজ্যকে অধিকার করতেন এবং এই দুরাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাসী

কাসীর রাজধানীর নাম বারাণসী। ষোড়শ মহাজনপদের এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। জাতক পাঠে দেখা যায়, বারাণসীর রাজাকে ব্রহ্মদত্ত নামে আখ্যায়িত করা হতো। শুধুমাত্র জাতক পাঠে নয় মজঝিম, নিকায়ে, দীর্ঘনিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে কাসী রাজ্যের বহু প্রাচীন ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয় এবং কাসীর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু ইতিহাস জানা যায়। কাসীর রাজারা ছিলেন খুবই উদার এবং কাসী রাজ্য শিল্প শিক্ষায় খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। বুদ্ধের সময়কালে কাসীর উৎপাদিত দ্রব্যকে কাসিক বা কাশীক বলা হতো। এই নামানুসারে কাসিক বস্ত্র, কাসিক চন্দন প্রভৃতি নাম বলা হতো।[৯২] কাশীর রাজধানী বারাণসী ছিল এক প্রাচীন নগরী। বরুণা ও অসি নামে গঙ্গার দু'ই শাখা এই নগরকে দু'দিক থেকে বেষ্টন করেছিল বলে এর নাম হয় বারাণসী। বারাণসী রাজারা অনেক শক্তিশালী ছিলেন বলে জানা যায়। জাতক পাঠে কাসীর সাথে কোশল ও অঙ্গ রাজ্যের দ্বন্দ্বের কথা জানা যায়। গৌতম বুদ্ধের সময় কাসী রাজ্যের পতন হয়। কোশল কাসী রাজ্যকে অধিকার করে।[৯৩] বারাণসীকে ব্যবিলন ও মধ্যযুগীয় রোমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে,

æBenares in this respect resembled ancient Babylon and medieveal Rome, being the coveted prize of its more warlike but but less civilised neighbours'' [৯৪]

কাসীর শাসন পদ্ধতি নমনীয়তার কারণে খ্রি: পূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় এবং এই সময় থেকে এই রাজ্যটি কোশলের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে। আর তখন থেকে কাসী কোশলের নামে পরিচিতি লাভ করে। [৯৫] এই কাসীর নাম বিভিন্ন জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খুল্লবোধি জাতক, উদয় জাতক, পানীয় জাতক, কুম্ভজাতক মহাবোধি জাতক এবং অন্যান্য অনেক জাতকে কাসীর নাম পাওয়া যায়। [৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

কোসল

প্রাচীন কোসল রাজ্য বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা ও তার সংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত। কোশল রাজ্য ছিল কাসীর প্রতিবেশী এক বৃহৎ রাজ্য। উত্তর কোসলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী এবং দক্ষিণ কোসলের রাজধানী ছিল কুষাবতী। শাসন পদ্ধতি সুবিধার জন্য রাজ্যটিকে উত্তর কোসল ও দক্ষিণ কোসল এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এতে কোসল রাজ্যের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হয় এবং এতে বহু সামন্ত রাজারা কোসলের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। প্রসেনজিত ছিলেন কোসলের রাজা। কোসল রাজ প্রসেনজিত সম্পর্কে সংযুক্ত নিকায়ে যে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন অতিশয় একজন ধার্মিক রাজা ও নিরহংকার সফল শাসক। এই কোসল রাজ্যে অনাথপিণ্ডিক নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন যিনি দান, ধর্ম ও জনসেবার জন্য সমাজে এবং বিভিন্ন জাতকে এবং মিলিন্দ প্রশ্নে নাম পাওয়া যায়। তিনি শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহার নামক একটি বিশাল বিহার বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্যদের জন্য দান করেছিলেন। যার নাম আজো বহন করছে। এছাড়াও খাতনামা ধনাঢ্য উপাসিকা বিশাখা ছিলেন কোসলের অধিবাসী। [৯৭] প্রাচীন কোসলের নাম নন্দিকমৃগ জাতকেও [৯৮] উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৃজি (বজ্জী)

বৃজ্জি রাজ্য ছিল একটি স্বয়ং-শাসিত প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য। রিস ডেভিডসের মতে ৮টি গোষ্ঠীর সংঘ নিয়ে বৃদ্ধি রাজ্য গঠিত হয়েছিল। [৯৯] বজ্জী রাষ্ট্রটির অবস্থান ছিল বর্তমান ভারতের উত্তরাংশ ও নেপালের দক্ষিণাংশ। এর রাজধানী ছিল বৈসালী। বজ্জীদের অধীনে আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। যথা: শাক্য, কোলিয়, লিচ্ছবী, ভগ্ন, বিদেহ, বুলি, কালাম ও মৌর্য। তখনকার সময়ে বজ্জীর আন্ত:রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতির প্রবল প্রভাব ছিল যা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের সময়ে বজ্জী রাজ্যটি ছিল খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। বজ্জী রাষ্ট্রতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের জন্য জুরি পদ্ধতির মতো বিচার প্রণালী প্রচলিত ছিল। নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা হতো সে কারণে অপরাধী ব্যক্তিকে অপরাধের মাত্রানুসারে যোগ্যতার শাস্তি প্রদানের ব্যাবস্থাও ছিল।

মল্ল

মল্ল রাজ্যকে দু'অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং এখানে গণমূলক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হতো। মল্লর রাজধানী ছিল দু'টি। একটির নাম ছিল কুশিনারা, আর অপরটির নাম ছিল পাবা। মল্ল রাজ্যটির

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান ছিল ঠিক বজ্জীদের পূর্বে ও কোশলের পশ্চিমে অর্থাৎ বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরাক্ষপুর জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে খ্রি:পূ:ষষ্ঠ শতকে অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত। দু'টি অঞ্চলই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এই সময়েই মল্ল-রাজ্য প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। তথাগত বুদ্ধের ধর্ম প্রচারকালে মল্লরা প্রথমে বিরোধিতা করেছিল। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মল্লনেতা রোজ, রাজপুত্র দর্ব, মল্লদেশের কর্মকার চুন্দ ও পুক্কুস, খণ্ডসুমন, ভদ্রক, রাশিয় প্রভৃতি মল্লবাসীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মল্লরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসারতা লাভ করে।[১০০] উল্লেখিত কুশ জাতকে মল্লরাজ্যের নাম পাওয়া যায়।[১০১]

চেতী (চেদী)

জাতক সাহিত্যে চেতী রাজ্য সম্পর্কে জানা যায় এর অবস্থান ছিল যমুনা নদীর অনতিদূরে। বর্তমান ভারতের বৃন্দেলখণ্ড ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে চেতী রাজ্য গঠিত। ঋগ্বেদে চেতী অধিবাসীদের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এর রাজধানীর নাম ছিল শোথ্লিবতী। মহাভারত অনুসারে শোথ্লিবতীর পরবর্তী নাম হয় শুক্তিমতী। প্রাচীন ভারতের উপজাতির মধ্যে চেতী রাজ্যের অধিবাসী ছিল অন্যতম।

বংস

বংস রাজ্যটির অবস্থান ছিল বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে। এর রাজধানী ছিল কোশাম্বী। বর্তমানে কোশাম নামে পরিচিত। এ রাজ্যে গণমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের সময়ে এ গণমূলক শাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। এখানকার সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা উদয়ন। উল্লেখ্য যে, উজ্জয়নীয় রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের সাথে রাজা উদয়নের শত্রুতা ছিল। এ দু'রাজার মধ্যে দু একবার সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধের উদ্ভব ঘটে। উজ্জয়নীর রাজার হাতে উদয়ন একবার বন্দীও হয়েছিলেন।

কুরু

কুরু রাজ্যের অবস্থান বর্তমান ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের আমিন, কার্ণল ও পানিপথ জেলা নিয়ে গঠিত। এর রাজধানী ছিল ইন্দপ্রস্থ বা ইন্দ্রপট্ঠ। উল্লেখ্য যে, কুরু ছিল অতি ব্যাপক সাত যোজনব্যাপী বিস্তৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে কুরুরাজ্যের যোধিষ্ঠিদের বংশধরগণ রাজত্ব করতেন। কুরু একটি গোষ্ঠীর নাম ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে কুরু রাষ্ট্রকে 'ধৃতরাষ্ট্র' বলে মহাভারতে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে 'কুরু' রাজ্যের কয়েকজন রাজ্য প্রধানের নাম পাওয়া যায়, তন্মেধ্যে ধনঞ্জয়, কৌরব্য ও সূতসোম ইত্যাদি। [১০২]

> æThe reigning dynasty according to Pali Text belonged to the Yuddhitthila gotta, that is the family of Yudhisthira". [১০৩]

এছাড়া কুরুরাজ্যটি ইন্দপ্রস্থের রাজধানী ছিল সেটি বিভিন্ন জাতকে উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সম্ভব জাতক, দশব্রাহ্মণ, সৌমনস্য, বিদূরপণ্ডিত, মহাসুতসোম, ধূমকারী জাতক। উল্লেখিত উপরোক্ত জাতকে কুরুরাজ্যটির নাম পাওয়া যায়। [১০৪]

পাঞ্চাল

পাঞ্চাল রাজ্য ভারতের বর্তমান উত্তর প্রদেশের রোহিলোখণ্ড ও ফরুক্কাবাদ জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত।মহাভারত, বৌদ্ধজাতক এবং দিব্যাবদান মতে ভাগিরথী নদীর উত্তর অংশই হচ্ছে উত্তর পাঞ্চাল। উত্তর পাঞ্চালের বর্তমান রাজধানী ঐচ্ছিত্র বা ছত্রবতী। পাঞ্চাল রাজ্যটি বর্তমানে বেরিলী জেলা রামনগর নামে পরিচিত। আর দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য ও কাম্পাল। বর্তমানে এটি ফারাক্কাবাদ জেলায় অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের সময়ে পাঞ্চালের রাজা ছিলেন চুলানি ব্রহ্মদত্ত। তিনি শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

মৎস

প্রাচীন মৎস রাজ্যটি বর্তমান রাজপুতনার জয়পুর, ভরপুর ও আলোয়ার অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ রাজ্যের সীমানা ছিল চম্বল স্বরসতী নদীর তীরস্থ মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই মৎস রাজ্যটি প্রথমে চেদী এবং পরবর্তীতে মগধের সাথে অর্ন্তভুক্ত হয়। তথাগত বুদ্ধের সময় বিরাট নামক এক রাজা এতে রাজত্ব করতেন বলেই রাজধানীর নাম হয় বিরাটনগর।

সুরসেন

বর্তমান মথুরা ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে সুরসেন রাজ্যটি গঠিত। এর রাজধানী ছিল মথুরা। যমুনা নদীর তীরেই এর অবস্থান। পুরাণে ও মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, প্রাচীনকালে যদু বা যাদব বংশ

Dhaka University Institutional Repository

এখানে রাজত্ব করতেন। সুরসেনের রাজা ছিলেন অবন্তীপুত্র। তিনি ভগবান বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের জন্য অনেক অবদান রাখেন। তিনি একজন ন্যায়বান রাজা ও ন্যায়বান শাসক ছিলেন।

অস্‌সক

বর্তমান ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরী নদী তীরস্থ বিস্তীর্ণ এলাকায় অস্‌সক রাজ্যের অবস্থান। বিশিষ্ট অর্থ শাস্ত্রের টীকাকার ভট্‌ট স্বামীন অস্‌সক মহারাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন। পাণিনির মতে, অস্‌সক দক্ষিণাত্যের অশ্বক নামে পরিচিত। এর রাজধানী ছিল পোটালি যা পোটান নামে পরিচিত। এটি বর্তমান হায়াদ্রাবাদের নিকটবর্তী স্থান। বুদ্ধের সময়ে সুজাত নামে এক রাজা এ রাজ্য রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন প্রথম অস্‌সক রাজের পুত্র। এ রাজ্যের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহমূলক কোন ঘটনা বাতখনকার শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

অবন্তী

অবন্তী ছিল বর্তমান মধ্য প্রদেশের মালেয়া, নেমার ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে। অবন্তী রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণ অবন্তীর রাজধানী ছিল মাহিষমতী। উত্তর অবন্তীর শাসনভার পরিচালনা করতেন রাজা বিশ্বভূ এবং দক্ষিণ অবন্তীর রাজা ছিলেন চণ্ডপ্রদ্যোত। তিনি স্বৈরতান্ত্রিকভাবে শাসনকার্য চালাতেন। এই রাজ্যে মহাকত্যায়ণ, ধর্মপাল, ঋষিদত্ত, অভয় কুমার প্রভৃতি জ্ঞানী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। [১০৫] চিত্তসম্ভূত জাতক [১০৬] থেকেও উল্লেখ পাওয়া যায় যে উজ্জয়িনী নগর নিয়েই অবন্তীরাজ্য গঠিত ছিল।

গান্ধার

বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং রাওয়ালপিণ্ডি জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত প্রাচীন গান্ধার রাজ্য। তক্ষশীলা এ রাজ্যের রাজধানী। পরবর্তীতে এর নাম হয় রাওয়ালপিণ্ডি। শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম বিশ্ব প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল তক্ষশীলা। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের সময় এ রাজ্যের রাজা ছিলেন পুক্কুসাতি। তিনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। মৈত্রী চিত্তে তিনি শাসনকার্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করতেন। বিশেষ করে শিক্ষা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশীলার নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এখনো সেই তক্ষশীলা প্রাচীন শিক্ষা, বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের সাক্ষী বহন করে। [১০৭] উল্লেখিত গান্ধার জাতকেই [১০৮] গান্ধার রাজ্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

কম্বোজ

কম্বোজ রাজ্য বর্তমান পাকিস্তানের হাজরা জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত। কম্বোজের রাজধানীর নাম রাজপুর। বর্তমান নাম হচ্ছে বাজৌরী। এতে রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি চালু ছিল কিন্তু পরে গণতন্ত্র শাসন পদ্ধতির প্রচলন হয়। রাজধানীর নাম ছিল দ্বারকা। কম্বোজ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়। মহাভারতেও কম্বোজের উল্লেখ আছে। আর্য বসতি ভারতের গঙ্গা যমুনা অঞ্চলে বিস্তৃত হলে কম্বোজের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত অভিযানের সময় কম্বোজ রাজ্যটি শেষ হয়ে যায়। তখন এই অঞ্চলে প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠে। [১০৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে রাজ্যগুলোর শাসন ব্যবস্থাসহ নানা অর্থনৈতিক এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। বিশেষ করে এ সব রাজ্যে ও রাজন্যবর্গের নিকট গৌতম বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী ও করুণার প্রভাব ছিল। অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় রাজতান্ত্রিক শাসন ধারা প্রবর্তিত থেকেও গণতান্ত্রিক শাসন ধারাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বৌদ্ধ শাসন পদ্ধতি অনুসারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজার কাছে সব মানুষ সমান। রাজার কাছে কোন জাতিভেদ, ধর্মভেদ বা বর্ণবৈষম্য থাকবে না। সমাজ ও রাজ্য শাসন পদ্ধতিতে কোন শ্রেণিবৈষম্য, পেশাবৈষম্য থাকবে না। বিশেষ করে মানুষ হিসেবে মানুষের দোষ-গুণ বিচার করে রাজ্য পরিচালনা করতে হবে। সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন প্রকার বৈরি বা সংঘতের সৃষ্টি হবেনা প্রভাব পড়বে না। রাজ্যে সুখ, শান্তি ও প্রগতি আসবে। জনগণ সুখে অবস্থান করতে পারবে। অতএব বলা যায় বর্তমান সময়েও শুধু

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নয় আধুনিক বিশ্বে প্রাচীন সময়ের মতো রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ শাসন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বুদ্ধের ধর্মদর্শন অপেক্ষা রীতি শাসন ও অনুশাসন ছিল স্থবিরতাকে ভেঙ্গে অগ্রসরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মানুষের মধ্যে যে প্রচলিত ভেদ বৈষম্য ছিল তা ভেঙ্গে দেওয়া। মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

প্রশাসনিক অবস্থা

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আজকের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যেও নানা পর্যায় ও নানা বিভাজন ছিল। নাগরিক জীবনে নেগম, গণবন্ধন, সেণি, পুগ প্রভৃতির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক জীবনে শ্রেষ্ঠী, স্বার্থবাহ কিংবা জৈষ্ঠকরা এর প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। সে সময় বণিকদের কিংবা তাঁদের পরিবারের মধ্যে সৃষ্ট কোন বিবাদ মীমাংসা সমাধানের ক্ষমতা এদেরই ছিল। [১১০]

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্ষেত্রে দেখা যায় রাজা নিজে বিচার বিনিশ্চয় করতেন এবং বিচার নিষ্পত্তির জন্য অন্য কর্মচারীও নিযুক্ত করতেন। উল্লেখিত বালোদক জাতকে [১১১] দেখা যায় রাজা তাঁর রাজ্য পরিচালনার জন্য অর্থ ও ধর্ম অনুশাসক রাখতেন। এদের মধ্যে বিনিশ্চয় মহামাত্র এবং ব্যবহারিক এই স্তরের নাম উল্লেখযোগ্য। মহামাত্রেরা প্রথমে অভিযোক্তার বিচারকার্য করতেন নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযোক্তাকে মুক্তি দিতেন। কিন্তু দোষী হলে ব্যবহারিক দরবারে পাঠাতেন। প্রয়োজন হলে তাকে রাজার অধীনে পাঠানো হতো। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বিচারে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে অভিযুক্তারা সরাসরি রাজার কাছে আবেদন করতে পারতেন। কোন কোন সময় উচ্চপদস্থ অভিযোক্তরা হলে রাজা নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। দোষী ব্যক্তিকে রাজ কর্মচারীরা গ্রেপ্তার করতো । ভগবান বুদ্ধ বিচার ও দণ্ডদানের নিরপেক্ষতা থাকার জন্য বার বার বলেছেন। তাই তথাগত বুদ্ধের উক্ত নিম্নরূপ-

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
অওনো সুখ মেসনো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং॥
সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি।
অওনো সুখমেসনো পেচ্চ সো লভতে সুখং।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য যে সুখাকাঙ্খী অন্য জীবনকে দণ্ড দিয়ে হিংসা করে, পরকালে সে কখনও সুখ পায় না। নিজের সুখ প্রাপ্তির আশায় যে সুখান্বেষী অন্য জীবনকে দণ্ড দিয়ে হিংসা করে না, পরলোকে তার সুখ লাভ হয়।

ভগবান বুদ্ধ আরও বলেছেন----

যো দণ্ডেন অদন্তেসু অপ্পদুটঠেসু দুস্সতি।
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি ॥
বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনং।
গরুকং বা'পি আবাধং চিত্তকখপংব পাপুণে ॥
রাজতো বা উপস্সগগং অবভক্খানং'ব দারুণং।
পরিকখয়ংব ঞাতীনং ভোগানং'ব পভঙ্গুরং ॥
অথবস্স অগারানি অগ্গি ডহতি পারকো।
কায়স্স ভেদা দুপ্পঞঞো নিরযং সো' পজ্জতি ॥[১১৩]

অর্থাৎ নিরস্ত্র এবং নির্দোষ ব্যক্তির উপর যে দণ্ড প্রয়োগ করে সে শীঘ্রই দশরকম প্রতিকূল অবস্থার কোন একটিতে পতিত হয়। সে তীব্র যন্ত্রণা, ক্ষয়-ক্ষতি, অঙ্গচ্ছেদের মতো কঠিন দু:খে নিমজ্জিত হয়। তার কঠিন ব্যাধি বা চিত্ত বিপেক্ষ ঘটে, সে রাজদণ্ড, যশোহানি, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পদনাশ হেতু দু:খ পায় অথবা তার গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়। মৃত্যুর পর তার গতি হয় নরকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এইভাবে মানুষের মধ্যে নৈতিকবোধ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান বুদ্ধ তাঁর নিজের বক্তব্যকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ ধনঞ্জানি সূত্রে উল্লেখ করেছেন, নিরপেক্ষ, নিরপরাধ ও পূণ্য পথ থেকে করণীয় জগতে বহু কর্মই আছে যা সম্পাদন করা উচিত। পাপ পথ বর্জন করে এই পূণ্য পথকে অনুসরণ করতে হবে।

প্রশাসনিকভাবে 'পুগ' পরিষদ নাগরিক জীবনে নগর প্রশাসনে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই পুগ পরিষদ বারাণসী নগরের গরীব ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেকালে বণিকদের প্রশাসনিক কাজে ক্ষমতা থাকলেও রাজ্যের প্রধান বা রাষ্ট্রের রাজা নিজেরা প্রশাসনিকভাবে নগর শাসন ব্যবস্থার ভূমিকা পালন করতেন। নগরের নির্মাণ, সংস্কার এবং অন্যান্য নগরের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। [১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

মিলিন্দপ্রশ্ন নামক গ্রন্থে [১১৫] পাওয়া যায় সম্রাট অশোক ছিলেন পাটলিপুত্র নগরের প্রধান ধর্মরাজা। রাজার সমস্ত কাজে সহায়তা করতেন মন্ত্রীপরিষদ। মন্ত্রীপরিষদের উপদেষ্টামণ্ডলী ছিল যা প্রশাসনিক ও আইন পরিষদ গঠন করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার সময়েও রাজকীয় বিষয়ের মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনগণকে বা জনসাধারণকে জানানো অর্থাৎ সংসদে আলোচনা করা হতো। [১১৬] তথাগত বুদ্ধের সময়ে আমরা দেখেছি প্রশাসনিক বিষয় সমূহ লিচ্ছবিদের সাথে মিলিত হয়ে আলোচনাপূর্বক গ্রহণ করতেন। তখনকার দিনে লিচ্ছবিদের বিচার ব্যবস্থা খুবই সুন্দর ছিল। তারা সমস্ত বিচারের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। লিচ্ছবিদের বিচার পদ্ধতি কয়েকটি স্তরে সাজানো ছিল। প্রশাসনিক কার্যক্রমে লিচ্ছবিরা বেশ উন্নত ছিল। [১১৭] সেকালে নগরের জনপদ ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল।তাই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মন্ত্রী কিংবা উপদেষ্টা মণ্ডলীর গভীর সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় দেখা যায় এবং মন্ত্রীপরিষদ আছে সেকালেও ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীর দায়িত্বভার অর্পণ করা হতো মন্ত্রীদের উপর। যেমন আইন ও বিচার সংক্রান্তের প্রধান ছিলেন বিনিচ্ছয়ামচ্ছ বা বোহারিক মহামত্ত। জমি জরিপ ও শুল্কের পরিমাপ নির্ধারক প্রধান ছিলেন রজ্জু গহক অমচ্চ। হিসাব সংরক্ষণ মন্ত্রকের প্রধান ছিলেন গণকমহামত্ত (গণক মহামাত্য)। তিনি বিভিন্ন সরকারি মহলের কাজকর্ম এবং হিসাব সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব পালন করতেন। সেনানায়ক মতামত্ত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রধান সরকারি কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকতেন সব্বতথক মতামত্ত (সর্ব বিষয়ক মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী)। [১১৮] মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে [১১৯] ভণ্ডাগারিক (কোষাগারাধ্যক্ষ)ও অমাত্য হিসেবে পরিচিত। তিনি রাজকীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধান ও দায়-দায়িত্ব পালন করতেন এবং অগারক নামে এক শ্রেণির কর্মচারী ছিল যারা তাঁর সার্বিক কাজে সহায়তা প্রদান করতেন।

পালি সাহিত্যে দৃষ্ট হয় যে, নাগরিক জীবনে এক শ্রেণির কর্মচারী ছিল যা গুত্তিক নামে পরিচিত যারা নগর প্রসাশনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং বোহারিক সহায়তার অধীনে নিয়োজিত থাকতেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং তাদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গুত্তিকের ক্ষমতা ছিল। দুর্নীতি যে কোন বিষয়ে নগরবাসীর নগর গুত্তিকের কাছে অভিযোগ করতেন এবং দোষী ধরে এনে শাস্তি প্রদান করতেন। রাজভট্ট নামের কর্মচারী ছিলেন যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রচুর ক্ষমতা রাখতেন।

পালি সাহিত্যে দেখা যায় যে, নগরগুলোর যাতায়াতের পদগুলি নিরাপদ ছিল না । প্রায় সময়ই সন্ত্রাস, চোর-ডাকাতের আনা-গোনা থাকতো এবং সর্বদা বিপদের আশংকা থাকতো। শ্রাবস্তী ও

Dhaka University Institutional Repository

সাকেত নগরে স্থলপথে সন্ত্রাসীদের অত্যাচার ছিল বলে জানা যায়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষক রাজভট্ট সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তি প্রদান করতেন। পালি সাহিত্যে নাগরিক জীবনে অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হতো। যেমনঃ হত্যা, চুরি, চৌর্যবস্তু সংরক্ষণ, ডাকাতি, প্রতারণা, ব্যাভিচার প্রভৃতি অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান ছিল। শাস্তির মধ্যে ছিল মৃত্যুদণ্ড , নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত অঙ্গচ্ছেদ কিংবা অর্থদণ্ডের নিয়ম ছিল। [১২০] এছাড়া মিলন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে বেত্রাঘাত পেরেকবিদ্ধ, ফুটন্ত তৈলে অভিসিক্ত, এমনকি শৈলবিদ্ধ করে কিংবা অসি দ্বারা শিরচ্ছেদ করার বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু এরকম অমানুষিক শাস্তি কতটুকু কার্যকর ছিল তা বলা কঠিন। নাগরিক জীবনে অপরাধীর অপরাধ দমন করা ছিল একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই নাগরিকের অপরাধী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট ধরিয়ে দিতেন। আবার অনেক নগরবাসীরা সামাজিক অপরাধীকে নগর থেকে বের করে দিতেন। কিন্তু নগরবাসীর বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন অভিযোগ করতো না। তখনকার সময়ে অপরাধীদের কারাগারে রাখা হতো।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নাগরিক জীবনে প্রশাসন ব্যবস্থায় শুল্ক আদায়ের রীতি চালু ছিল। যিনি শুল্ক আদায়কারী বলি সংগ্রহকারী বলিসাধক এবং শুল্কসংক্রান্ত বিষয় পর্যকেক্ষণকারীকে কম্মিক নামে অভিহিত করা হতো। নাগরিক জীবনে কম্মিকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার দিনে নগরে প্রবেশ এবং নগরের বাইরে প্রবেশ করলে শুল্ক দিতে হতো। সুত্তবিভাগ হতে জানা যায়, রাজগৃহ হতে বণিকরা শকট নিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে যাওয়ার সময় কম্মিকরা শকটটিকে ধরে ফেলেন। কম্মিকদের এই সততার উপরও নগরের আয় অনেকখানি নির্ভর করতো। সে সময় অতিরিক্ত ব্যয়ভারের প্রয়োজনে নাগরিকের উপর শুল্ক নির্ধারণ করা হতো। তবে এমনও দেখা যায় যে, রাজার বিশ্বাস ভাজন, রাজার অনুরক্ত কিংবা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি শুল্ক প্রদান না করেও নগরে বসবাস করতো। সে সময় নগরকে সুন্দর সুরক্ষা ব্যবস্থায় প্রশাসনিকভাবে দ্বায়রক্ষক-এর ভূমিকা কম ছিল না। এই দ্বায়রক্ষক শুধুমাত্র পরিচিত লোকদেরই নগরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করতেন এবং অপরিচিত লোকদের নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হতো না। বড় বড় নগরের দ্বার রাতে এবং যুদ্ধের সময় বন্ধ থাকতো এ জন্য কোন ক্ষমতাশালী কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তি নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই দেখা যায় রাজকুমার বিরুডব কোশল রাজ্যের সিংহাসন দখল করেছিলেন, তখন তাঁর পিতা প্রসেনজিত মগধ সম্রাট অজাতশত্রুর সাহায্য নিয়েই রাজগৃহে উপস্থিত হন কিন্তু রাতে দ্বার বন্ধ থাকায় তাঁর পক্ষে নগরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নি। [১২১] নগর প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উপলব্ধি করা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

সেকালে আইন শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণে নাগরিক জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার কারণে নগরে প্রবেশ এবং নগর হতে বাইরে প্রবেশের জন্য নগরবাসীকে খাজনা দিতে হতো। খাজনা আদায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা খুবই কঠোর ছিল। তাই শুধুমাত্র বৈধ পরিচয়কারী কিংবা পরিচিত ব্যক্তিরাই কেবল নগরে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত ছিল যার ফলে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষেরা নগর জীবনের সাথে অপরিচিত ছিল। এজন্যে গ্রামজীবন ও নগরজীবনের পারস্পারিক সম্পর্ক বৈষম্য ও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। [১২২]

সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষের প্রথম পরিচয় ছিল তার সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা। মানুষের পরিচিতি শুধু মানুষ হিসেবে নয়, মানুষের পরিচয় হচ্ছে তার কৃতি বা কাজ। যেমন প্রাণীদের জীবনের একমাত্র প্রেরণাই হচ্ছে বেঁচে থাকা। তাই প্রাণীরা বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যতটুকু সম্ভব প্রাণীরা প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় করে নেয়। এর নামই হচ্ছে জীবন-জীবিকা। মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রধান উৎস হচ্ছে প্রকৃতিকে উত্তম কিছু দেয়া, যা প্রকৃতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে মুক্ত করা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি হওয়ার অর্থাৎ জীবন-জীবিকার সমৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করে গড়ে তোলা। দৈহিক ও মানসিক প্রয়াসের জন্য এই জীবিকাই মানুষ পর্যায়ক্রমে আয়ত্ব করে চলেছে। এই প্রয়াসের একমাত্র মাধ্যমে হচ্ছে পরিশ্রম। এই পরিশ্রমের ফলে মানুষ তার সংস্কৃতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

মানুষ অন্য জীবের চেয়ে উন্নত। এই উন্নতির এক মাত্রই উৎস হচ্ছে পরিশ্রম। যার ফলে মানুষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে এবং পরিশেষে সভ্যতার এক একটি উপাদান সৃষ্টি করছে। যাই হোক সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে জীবিকার প্রয়াস বা শ্রমশক্তি। মানুষ তার সংস্কৃতিকে নানা বিষয় অবলম্বনে প্রয়াস জীবিকায় চালায়। নাচ, গান, বাজনা, কৌতুক, অভিনয়, খেলাধূলা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে তাঁর সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তাই নাগরিক জীবনে এসব সাংস্কৃতিক বিষয় তুলে ধরে রাখটাই মূল উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতিমূলক বিষয়ে যারা চর্চা করেন, তাঁদের মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মননশীলতা রুচিবোধ প্রকাশিত হয় এবং উপভোগ করেন, তাদের মানসিকতারও প্রতিফলন লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে যা নানাভাবে মনে সাড়া জাগায়। অসংস্কৃতজন কোনো ব্যক্তি ও যে আনন্দ লাভ করতে পারে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তি তার চেয়ে উন্নত ও রুচিকর বিষয়ে আনন্দ দিতে পারে। তাই বলা যেতে পারে, ব্যক্তি বা জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ হয়। কারণ ব্যক্তি মাধ্যমেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। যে জাতি এবং যে ব্যক্তি যত উন্নত তাঁর সংস্কৃতিও তত উন্নত। তাই বলা যায়, সংস্কৃতির আসল পরিচয় মানুষ। মানুষের আসল পরিচয় সংস্কৃতি। একে অন্যের পরিপূরক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নব যুগের সৃষ্টি হয়। পালি সাহিত্যে নাগরিক জীবনে অসংখ্য সংগীতজ্ঞ প্রেমিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নট-নটী, ক্রীড়াবিদ, যারা নগরেই বাস করতেন, তারা বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজ নিজ দায়িত্ব ও সক্ষমতা নিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করতেন। পালি সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বিলাস বহুলতা সম্পর্কে প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ্যণীয় চুল্লবর্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, নারী-পরুষ একত্রে নৃত্য পরিবেশন করতো। সে সময় প্রায় ধনী ব্যক্তির বাসায় গানের ও নৃত্য শিল্পী থাকতো। নানা পেশাধারী শিল্পীরা নগরে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, মেলায় কিংবা মুক্ত উদ্যানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করতো। তথাগত ভগবান বুদ্ধের সময় একজন শিল্পী ছিলেন যিনি বৈশালী নগরে সেরা ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি হলেন অম্বপালি। নাচ, গান, বাজনা ও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। [১২৩] ধনী ও রাজন্য শ্রেণির লোকের আমোদ প্রমোদের মধ্যে শিকার, অস্ত্রচালনা, নৃত্যগীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। রাজকন্যারা এবং উচ্চ শ্রেণির কন্যারা কূণ্ডল এবং ভিটা অর্থাৎ হকি খেলতে পছন্দ করতেন। [১২৪]

এছাড়া অন্ধভূত জাতকে [১২৫] অক্ষক্রীড়া সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। এই জাতক পাঠে আরো জানা যায় মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করলে ক্রীড়ায় জয় লাভ করা যায়। এ খেলায় পণ রাখার রীতি প্রচলিত ছিল এবং পণে না পারলে অর্থাৎ হেরে গেলে সময়ে সময়ে সর্বসান্ত হতেন।[১২৬] জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন নাচ,গান, বাজি, বাজনা বিভিন্ন খেলা এবং বিভিন্ন উৎসবের আলোচনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভেরীবাদক জাতকে [১২৭] কার্তিকোৎসবের সময় নাচ গান হতো সাথে বাজনা হতো সেখানে সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে খেলা দেখাতো। আলোচনায় জাতক সাহিত্যে যে শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই যে উৎসব পালন করতো সেটা নয়। পুস্পরক্ত জাতক [১২৮] থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, উৎসবের দিন দরিদ্র লোক অর্থাৎ গরীব লোকেরা ভাল বস্ত্র পরিধান ও গন্ধমালা দিয়ে সুগন্ধিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উৎসবে যোগদান করতো । সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরেকজন ছিলেন তিনি হচ্ছে রাজগৃহের সালবতী। তখনকারদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ, গান ইত্যাদি পরিবেশনের সময় বীণা, ঢোল, করতাল, খোল ইত্যাদি সরঞ্জাম ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে নাটক ছিল গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথাগত বুদ্ধের সময় রাজগৃহে একজন প্রখ্যাত অভিনেতা ছিলেন এবং তার বহু সংখ্যক সহযোগী বা সহযোগিনীদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাটক পরিবেশন করতেন। থেরগাথা গ্রন্থ হতে জানা যায়, তিনি একবার পাঁচশত মহিলা শিল্পী নিয়ে নগর এবং গ্রামে নানা উৎসবে নাটক অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

সেকালে বড় বড় ধনীরা নানা ধরনের উৎসব বা মেলার আয়োজন করতো। রাজগৃহের গিরগগ সমজ্জ প্রসিদ্ধ বার্ষিক মেলার উৎসব হতো।এই উৎসবটি বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে গিরিবগু সমাগম নামে অভিহিত। মানুষের এ রকম মেলা বা উৎসব দেখলে সংস্কৃতি শ্রেণির মনে আকর্ষণ করতো এবং সেখানে যোগদান করে দক্ষতা প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করতো। তাই মেলায় নাচ, গান, বাজনা ছাড়া কবির গান, দামাদা বাদ্য, কৌতুক, যাদুবিদ্যা বিভিন্ন প্রাণী-যেমন হাতি, ঘোড়া, মহিষ, বৃষ, অজ, মেষ প্রভৃতির যুদ্ধ প্রদর্শন হতো। এরুপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশীর ভাগ ছুটির দিনে উদযাপন হতো। যাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী ছিল নাগরিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধম্মপদ্ঠকথা মতে জানা যায় রাজগৃহের এক শ্রেণির পুত্র উগগসেন সুনিপুনা এক মহিলা ডিগবাজিকরের প্রেমেপড়েন। পরে তাকে বিয়ে করেন এবং তার পেশাটিকে শিখে ফেলে। কালক্রমে উগ্গসেন নিজ কর্মপ্রচেষ্টায় নিজেকে অন্যতম বাজিকর হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। উগগসেন এক বিশাল জনসমাবেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পালি সাহিত্যে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন নগরগুলোকে জাকজমকপূর্ণভাবে সাজানো হতো এবং সুন্দরভাবে অলংকৃত হাতিও ব্যবহৃত হতো।

সে সময় প্রমোদ উদ্যানটি ছিল অবসর ও বিনোদনে সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজা-রাণী, রাজ পরিষদের সদস্যবর্গ কিংবা নগরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা বেশীরভাগ অবসর বিনোদন করতেন। [১২৯] প্রাচীন ভারতবর্ষে নাগরিক জীবনের প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্যতম ছিল সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্রীড়া। এছাড়া সংগীত ও বিতর্ক ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্যে উল্লেখিত গুপ্তিল জাতকে [১৩০] গান্ধর্ব বিদ্যায় পারদর্শী গুপ্তিল গন্ধর্ব নামে

Dhaka University Institutional Repository

এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। বারাণসীতে সংগীত প্রতিযোগিতার সমস্ত দায়িত্ব রাজা নিজে গ্রহণ করতেন। রাজা কর্মচারীদের মাধ্যমে জানাতেন নগরবাসীদের সংগীত প্রতিযোগিতার সংবাদ। রাজপ্রাসাদের পাশেই এ অনুষ্ঠান নির্ধারণ করা হতো। অনুষ্ঠানের প্রধান থাকতেন রাজা। তার জন্য আসনের ব্যবস্থা থাকতো এবং প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতেন। অনুষ্ঠান রাজসাম্য, রাজকর্মচারী, রাজপাদোপজীবী লোকজন, ব্রাহ্মণ নগরবাসী উপস্থিত হয়ে মনোরম প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন।

প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী প্রধান প্রতিযোগিতা ছিলেন শুরু গুত্তিলা শিষ্য মুসিলা। এর মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতাও ছিল মনোরম বিষয়। এই প্রতিযোগিতাটি বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তি ও দার্শনিকরাই এর মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগীতায় উৎসাহ বোধ করতেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগীতার মধ্যে কুস্তি, পাশা খেলা, দণ্ডযুক্ত প্রভৃতি। "ঘটজাতক" [১৩১] হতে জানা যায়, এক রাজা কুস্তি খেলার সংবাদ নগরবাসীদেরকে জানিয়েছিলেন এবং এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুস্তি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানটি রাজপ্রাসাদের সামনে খেলার জায়গা তৈরি করে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। তখনকার দিনে চনুর ও মুক্তিকা নামক দুইজন সেরা কুস্তিগির ছিলেন। নির্ধারিত দিনে কুস্তিগিরের মধ্যে প্রতিযোগিতা লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই এক পক্ষের বিজয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, নগরবাসীর মধ্যে আনন্দের ধ্বনি মুখরিত হয়। তখনকারদিনে শ্রাবস্তীকে বীর নায়ক একজন ক্রীড়াবিদের প্রচুর যশ খ্যাতি ছিল।

তখনকারদিনে অভিজাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে পাশাখেলারও প্রচলন ছিল। পাশাখেলা কয়েকটি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা হতো এবং বড় কাঠের উপর খেলা হতো। পাশাখেলার মতো আরেকটি অন্য খেলারও উল্লেখ ছিল। খেলাটি দাবা খেলার মতো মনে হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে নাগরিকজীবনে নগরবাসীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয়াদি নিয়ে প্রচুর আমোদ প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান করতো। কিন্তু এর ফল সবদিক থেকে সুফলতা এনেছিল বলে বলা যাবে না রবং নগরজীবনে বস্তুগতভাবের জন্য অনেকের মধ্যে অলসতা ও বিলাসিতায় অনেক সময় নষ্ট হতো। তাছাড়া সাংস্কৃতিক বিলাসিতার কারণে নগর জীবন গ্রাম জীবন হতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। [১৩২] কিন্তু ভগবান বুদ্ধ বিলাসিতার মূল দিকে সর্বদা সচেতন থাকতেন। তাই ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, বাজনা প্রভৃতি উপভোগ থেকে সদস্যদের বিরত রাখতেন।[১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জানা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে নানা জাতের মানুষ ছিল। অর্থাৎ সে সময়ে একই সমাজে উচ্চ বর্ণের মানুষ এবং দাস-দাসীও বসবাস করতো। সে সময়ে বড় বড় প্রাসাদ ও শ্রেষ্ঠী ছিল। শ্রেষ্ঠীরা প্রাসাদে বসবাস করতো এবং দাস-দাসী কিংবা চণ্ডালরা সমাজের বিভিন্ন-জায়গায় বসবাস করতো । বর্তমানেও এগুলো প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনকালে বহু ধর্মীয় অনুশাসক ছিল যা বর্তমানকালে দেখা যায়। শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমানকালের মতো বিভিন্ন স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলেও গুরু গৃহ সবাই শিক্ষা লাভ করতো। সে সময়ে সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানকালের মতো সে সময়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, আবৃত্তি, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এছাড়া সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা যেমন কোন নিচ বংশীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না তেমনি বর্তমানকালেও সামাজিক এই রীতির যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

তথ্য নির্দেশনা

১. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৪৪।

২. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির; মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ.৪।

৩. বৌদ্ধ ভারত ঃ বিমল চন্দ্র দত্ত; মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ.৮।

৪. পলি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ করুনানন্দ ভিক্ষু; বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৪, পৃ.৫৫।

৫. পালি সাহিত্যে ধম্মপদ ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানু ১৯৯৭, পৃ.১২৮।

৬. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৬।

৭. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৫।

৮. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৯. বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ ড. মণিকুন্তলা হালদার দে; শ্রী ডি, এল, এস, জয়বর্ধন, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.৮।

১০. প্রাগুক্ত; পৃ.৯।

১১. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (ষষ্ঠ মুদ্রণ), জাতক নং-১।

১২. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৩৬২।

১৩. জাতক সন্দর্শন, প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ.২৩।

১৪. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (চতুর্থ মুদ্রণ), জাতক নং-৪৯৭।

১৫. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.২৪।

১৬. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.৪।

১৭. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৬।

১৮. বৌদ্ধ ভারত ঃ পৃ.৮।

১৯. পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগষ্ট,১৯৮০, পৃ.-১০৭।

২০. প্রাগুক্ত; পৃ.১০৮।

২১. প্রাগুক্ত; পৃ.১০৯।

২২. প্রাগুক্ত; পৃ.১১০।

২৩. প্রাগুক্ত; পৃ.১১১।

২৪. প্রাগুক্ত; পৃ.১১২।

২৫. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬২।

২৬. মহাবর্গঃ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির; ৬/এ নিউ বহুবাজার লেন কলকাতা, ১৯৩৭, পৃ.৩৭-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. প্রাগুক্ত; পৃ.৪১।

২৮. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬৩।

২৯. বৌদ্ধ ভারতঃ পৃ.৯।

৩০. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর বিন্যাস ঃ পৃ.৬৩।

৩১. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.৪।

৩২. বৌদ্ধ ভারত ঃ পৃ.৯।

৩৩. বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ পৃ.১৩।

৩৪. প্রাগুক্ত; পৃ.১৩-১৮।

৩৫. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৪ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-৫২৮।

৩৬. বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ পৃ.১৯-২০।

৩৭. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ঃ পৃ.৬৩-৬৪।

৩৮. জাতক (৬ষ্ঠ খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯ বাংলা (ষষ্ঠ মুদ্রণ), জাতক নং-৫৪৭।

৩৯. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬৪।

৪০. থেরীগাথা ঃ ড. বেলু রানী বড়ুয়া; বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার ফর বুড্ডিষ্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ৩১ শে জুলাই ২০০৪, পৃ.১২-১৪।

৪১. বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, পৃ.৫৬।

৪২. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১১ বাংলা (চতুর্থ মুদ্রণ), জাতক নং-৪৫৩।

৪৩. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.২।

৪৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৮-৬০।

৪৫. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.১৬।

৪৬. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.২।

৪৮. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬০।

৪৯. বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ পৃ.৮।

৫০. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ ড. সুনীল চট্টোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭, কলকাতা (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ.৬১।

৫১. জাতক (২ম খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-১৬৮।

৫২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ.৬১।

৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৪. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.২৬।

৫৫. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ পৃ.৬১।

৫৬. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.২৬।

৫৭. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৫৯।

৫৮. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৮১।

৫৯. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ঃ ড. সুনীল চট্টোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৭ (পঞ্চম মুদ্রণ) পৃ.৬৫।

৬০. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৯-৬০।

৬১. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩।

৬২. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-২।

৬৩. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-১।

৬৪. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.১৫।

৬৫. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬১-৬২।

৬৬. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৬৩।

৬৭. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫০০।

৬৯. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬৫।

৭০. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.৭৩।

৭১. প্রাগুক্ত; পৃ.৩।

৭২. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩৭৪।

৭৩. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-১৮২।

৭৪. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.১৩২।

৭৫. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-২৪৫।

৭৬. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-১৮৫।

৭৭. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬৬।

৭৮. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-১২৫।

৭৯. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.৭।

৮০. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬৭।

৮১. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩৪৭।

৮২. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩৬২।

৮৩. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-১৬৯।

৮৪. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.২৪৮।

৮৫. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৬৮।

৮৬. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ.১৪০-১৪১।

৮৭. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫০৬।

৮৮. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা ঃ অধ্যাপক প্রভাতাংশ মাইতি; শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪ (চতুর্থ মুদ্রণ) পৃ.৯৯।

৮৯. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ.১৪২।

৯০. কোশল ও মার সংযুক্ত ঃ ড. সুকোমল বড়ুয়া; বাংলা একাডেমী,ঢাকা জুন ১৯৯৮, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

৯১. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫০৬।

৯২. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ.১৪২।

৯৩. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা ঃ পৃ.৯৭।

৯৪. কোশল ও মার সংযুক্ত ঃ পৃ. ৫।

৯৫. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য ঃ পৃ.১৪২।

৯৬. খুল্লবোধি জাতক (৪৪৩), উদয় জাতক (৪৫৮), পানীয় জাতক (৪৫৯), কুম্ভ জাতক (৫১২), মহাবোধি জাতক (৫২৮)।

৯৭. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ.১৪৩।

৯৮. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৩৮৫।

৯৯. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা ঃ পৃ.৯৯।

১০০. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য ঃ পৃ.১৪৩।

১০১. জাতক (৫ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫১৩।

১০২. কোসল ও মার সংযুক্ত ঃ পৃ.৬-৮।

১০৩. কোশল ও মার সংযুক্ত ঃ পৃ.৬-৭।

১০৪. সম্ভব জাতক (৫১৫), দশব্রাহ্মণ (৪৯৫), সৌমনস্য (৫০৫), বিদূরপণ্ডিত (৪৫৫), মহাসুতসোম (৫৩৭), ধূমকারি (৪১৩)।

১০৫. কোসল ও মার সংযুক্ত ঃ পৃ.৭-৮।

১০৬. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৯৮।

১০৭. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ.১৪৬।

১০৮. জাতক (৩য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪০৬।

১০৯. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা ঃ পৃ.৯৭।

১১০. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫২।

১১১. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৮ বাংলা (পঞ্চম মুদ্রণ), জাতক নং-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১২. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ পৃ.১৪৯।

১১৩. প্রাগুক্ত; পৃ ঃ ১৪৯-১৫০।

১১৪. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫২।

১১৫. মিলিন্দ প্রশ্ন ঃ পৃ.১৪।

১১৬. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৩।

১১৭. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা ঃ পৃ.৯৯।

১১৮. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৩।

১১৯. মিলিন্দ প্রশ্নঃ পৃ.১৩০।

১২০. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৫৩।

১২১. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৪।

১২২. প্রাগুক্ত; পৃ.৫৫।

১২৩. প্রাগুক্ত; পৃ.৬৯-৭০।

১২৪. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.২৪।

১২৫. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৬২।

১২৬. জাতক সন্দর্শন ঃ পৃ.২৪।

১২৭. জাতম (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-৫৯।

১২৮. জাতক (১ম খণ্ড) ঃ জাতক নং-১৪৭।

১২৯. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৭০।

১৩০. জাতক (২য় খণ্ড) ঃ জাতক নং-২৪৩।

১৩১. জাতক (৪র্থ খণ্ড) ঃ জাতক নং-৪৫৪।

১৩২. পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন ঃ পৃ.৭১।

১৩৩. প্রাগুক্ত; পৃ.৭২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্মের ইতিবৃত্তকে জাতক বলে। জাতক শব্দের অর্থ যিনি জাত বা জন্মগ্রহণ করেছেন। গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনীগুলো জাতকাকারে লিপিবদ্ধ।

বৌদ্ধ সাহিত্য মতে, বুদ্ধ এক জন্মের পূর্ণকর্মের ফলে বুদ্ধ হননি। বুদ্ধ হতে হলে দশ প্রকার পারমী পূর্ণ করতে হয়। সে পারমীগুলো হলো দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষ। এ পারমীসমূহ পূর্ণ করবার জন্য বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুরকে অসংখ্যবার বিভিন্ন প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। জাতক সাহিত্যে বুদ্ধের ৫৫০ জন্মের কাহিনী বর্ণিত আছে। বুদ্ধ ধর্মোপদেশচ্ছলে শিষ্য-প্রশিষ্য কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করেই এ জাতকগুলো ভাষণ করেছেন। এগুলো অতি মনোরম ও চমকপ্রদ কাহিনী। ধর্মীয় জীবন গঠনের জন্য এর মূল্য অনস্বীকার্য্য।

প্রত্যেক জাতকে তিনটি অংশ রয়েছে যেমন-প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা ভূমিকা, অতীত বস্তু বা অতীত কাহিনী এবং সমাধান।

জাতকের প্রত্যেকটি গল্পকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। অপর দু'টি বিভাগ হল 'গাথা' এবং ব্যাকরণ। বর্তমান ঘটনাকে প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বলে। অর্থাৎ জাতকটি কাকে-কোথায় কখন এবং কি অবস্থায় ভাষণ করেছিল সেটি প্রত্যুৎপন্ন বস্তু। এটাকে জাতকের উপক্রমণিকাও বলা হয়। ঐ ভূমিকার ভিত্তিতে বুদ্ধ মূল কাহিনী বর্ণনা করতেন। সেটিই অতীত বস্তু। আবার অতীত কাহিনীর ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বর্তমান কাহিনীর পাত্র বা ব্যক্তি বিশেষের যে সম্পর্ক সেটিই হল জাতকের সমাধান। প্রত্যেক জাতকে এক বা একাধিক গাথা আছে। সে গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যাও জাতকে দেওয়া আছে।

মূল জাতক পদ্যে ও গদ্যে রচিত। পণ্ডিতদের মতে পদ্যাংশ অপেক্ষাকৃত পুরানো। এটা জাতকের প্রাণ স্বরূপ গল্পের সারাংশ সাধারণ গাথা-আকারে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। গদ্যাংশ সম্ভবত পরে জাতকের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে। এ গাথাগুলোকে 'অভিসম্মুদ্ধ' গাথা বলে। এদের নিচে এক প্রকারের অর্থকথা বা ব্যাখ্যা আছে। একে পালি সাহিত্যে 'বৈয়াকরণ' বা 'ভাষ্য' বলে।

বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদী। তাই জাতকের কাহিনীগুলোত জন্মান্তরকে স্বীকৃতি দেয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ এবং পূর্ণকর্ম প্রাণীকে কিভাবে সুখ-দুঃখ প্রদান করে তা জাতক পাঠে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতকের প্রধান বিশেষত্ব হল গল্পের চরিত্র বোধিসত্ত্ব নিজেই। তিনি কোন অতিমানব নয়। তিনি আমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। তিনি সৎ জীবন যাপন করছেন। সব সময় কুশল চিন্তা করেছেন। তিনি সকল অবস্থায় প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সেটিই জাতকের মূল উপজীব্য বিষয়।

জাতক কাহিনী শুধুমাত্র ধর্মীয় উপদেশে ভরপুত্র নয়। এর মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের জন-জীবনের চিত্রও ফুটে ওঠেছে। তখনকার দিনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনেতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি এ জাতক সাহিত্য থেকে।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে, জাতক প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য ভান্ডার। জাতকের প্রত্যৎপন্ন বস্তুতে বাংলা পাক-ভারত তথা এ উপমহাদেশের বহু ইতিকথা লুক্কায়িত আছে। এর যথার্থ আলোচনা গবেষণা, পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি। জাতক সাহিত্যের প্রভাব শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও এর বিপুল প্রভাব রয়েছে।

'জাতক' সাহিত্যে বুদ্ধ সমকালীন এবং এর পূর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছাড়াও সে সময়কার ব্যবসা-বাণিজ্য, পশু-পাখি এবং মানব জীবনের নানাবিধ কাহিনী অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। এ যেন একটি বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য জানার জন্য। অতএব বলা যায় পালি সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে জাতক সম্পর্কে বহু প্রকারের আলোচনা পাওয়া যায়। তেমনি ভাবে জাতক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল ইতিহাস সমৃদ্ধ মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং এসব তথ্যের আলোকে আমার এ অভিসন্দর্ভটির যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে প্রথমে জাতক পরিচিতির মধ্যে জাতকের পরিচয়, জাতকের উদ্ভব, জাতকের রচয়িতা ও রচনাকাল, সংগ্রহকাল, গাথা, বর্গ, নাম এবং জাতকের অংশ অর্থাৎ জাতক সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য জানা সম্ভবপর হয়েছে। জাতক একটি ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যবহুল এবং অন্যতম গ্রন্থ। এটি ধর্মোপদেশের কাহিনীও বটে বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানের সময় গভীর তত্ত্বগুলো মনোজ্ঞ করে তোলার জন্য নানা কাহিনীর অবতারণা করতেন। তাঁর এ অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনীতে জাতকসমূহের বর্ণনা ছিল অতি সমৃদ্ধ। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও গবেষকেরা বলেছেন জাতক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ জাতক সাহিত্যে ভারতবর্ষসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের ও বর্হিদেশের

Dhaka University Institutional Repository

জাতকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া জাতকের উৎস অর্থাৎ এটি বিভাবে, কখন কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভব হয় তার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই সামগ্রিক আলোচনা সাপেক্ষে জাতকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরাই হলো এ গবেষণা কর্মের প্রধান কাজ।

সমগ্র জাতক সাহিত্য আলোচনা করলে প্রত্যেকটি জাতকে বোধিসত্ত্বের চারিত্রিক মাধুর্য, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কুশল বা সদকর্মের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। তা একমাত্র সম্ভব করেছে শীলপালনে তিনি নিষ্ঠাবান এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন বলেই। এ জন্যই বৌদ্ধধর্মে শীলের প্রাধান্য সর্বপ্রথম। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন হলো শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার ধর্ম। জাতক সাহিত্যে এ সকল মানবিক গুণ, প্রাচীন সমাজের নানা ধরণের বৈচিত্র্যময় অবস্থা এবং সমাজ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় যা বর্তমান মানব সমাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং অনুকরণযোগ্য।

চরিত্র এমন এক শক্তি, ব্যক্তিত্ত্বের এমন একটি দিক যা ন্যায়নীতি ও নৈতিক জীবনাচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। চরিত্র মানব জীবনের এক মহামূল্যবান অবিনাশী সম্পদ। মানুষের সব সম্পদের মধ্যে চরিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। চরিত্র মানব জীবনের গৌরব মুকুট। মুকুট যেমন সম্রাটের শোভা বর্ধন করে তেমনি চরিত্রও মানব জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবনগঠনের মাধ্যমে শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করার প্রচেষ্টাই শীল পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। শীলপালনে চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়। যেমনঃ মানুষের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমতা আসে। চিত্ত লোভ, দ্বেষ, মোহমুক্ত হয়ে শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে। সকল প্রকার অশুভ চিন্ত দূর হয়। পারস্পারিক হিংসা বিদ্বেষ কিংবা বিবাদ দূর হয়। সকলের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি হয়। মৈত্রী পরায়ণ চিত্ত গঠন হয়। সকল প্রকার পাপাচার হতে মুক্ত থাকা যায়। শৃংখলা পরায়ণ এবং ন্যায়বান হওয়া যায়। অপরের জন্য আত্মোৎসর্গী করে তোলে। আধ্যাত্মিক এবং উন্নত জীবন গঠনে সহায়তা করে। বৌদ্ধ জাতকে বোধিসত্ত্বের এসব গুণাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

এসব গুণাবলী চরিত্রকে পবিত্র রাখে। এগুলো অর্জনের মাধ্যমে মানুষ চরিত্রবান হয়। চরিত্রবান ব্যক্তি সকলের প্রিয় হন। শীল পালনের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্র গঠন করা সকলের কর্তব্য।

বৌদ্ধ মতে শীলপালনকারীকে কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মগুলো নীচে দেওয়া হলো- যেমন ঃ প্রতিটি শীল সচেতনতার সাথে উৎসাহ সহকারে পালন করতে হবে। আচার-আচরণে

Dhaka University Institutional Repository

সংযমতা এবং পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখতে হবে। সব সময় কুশল চিন্তা করতে হবে। সম্যক বা সৎ স্মৃতি জাগ্রত রাখতে হবে। মৈত্রীপরায়ণ হতে হবে। লোভ, দ্বেষ, মোহের বশীভূত হতে পারবে না। প্রশংসা বা বিদ্বেষের জন্য আনন্দিত বা উত্তেজিত হওয়া যাবে না। এমন কোন কাজ করা যাবে না যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হয়।

শীলপালনের সময় এসব নিয়মাবলী পালন করা প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ এগুলো পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধভাবে শীল পালন করতে না পারলে শীলের সুফল লাভ করা যায় না। প্রতিটি জাতকে বোধিসত্ত্বের সদ্‌গুণের প্রকাশ পেয়েছে এবং একটি নৈতিক ও জ্ঞান সম্প্রযুক্ত মূল্যবোধের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি জাতকে প্রাচীন ভারতবর্ষে সামাজিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বিষয়াদি যেমন পাওয়া যায়, তেমনিভাবে গ্রাম, নগর, জনপদ সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। জাতক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য পালি, সংস্কৃত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্য উপস্থাপন পূর্বক জাতকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতে অনেক গ্রাম, দেশ, নগর ও জনপদের নাম পাওয়া যায়। নগর সমীক্ষায় দেখা যায় জাতকে ১৪৯ টির মতো নগর আছে। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় ও জাতক গ্রন্থে ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে দেখা যায় প্রধান প্রধান জনপদ এবং নগরসমূহ উত্তর ভারতে অবস্থিত ছিল। এসব গ্রাম ও জনপদকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতের রাজনীতি আবর্তিত হতো এবং এসব গ্রাম, নগর ও জনপদে নানা শ্রেণি পেশার লোক বসবাস করতো। অতএব বলা যায় প্রাচীন কালের ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালে রাষ্ট্র ও কাঠামো বিকাশ লাভ করেছে।

জাতক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধের সমসাময়িককালর এবং পরবর্তী কয়েক শতবর্ষ পরিব্যপ্ত ভারতীয় সমাজ জীবনে নর-নারীদের জন-জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং বিচার বিশ্লেষণে প্রাচীন ভারতবর্ষের নর নারীদের জন জীবন সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাচীন ভরতবর্ষের নর-নারীদের জন-জীবনের আলোচনায় বিবাহ প্রথার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

বহু প্রকার বিবাহের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনযুগে রাজকুলের মধ্যেও বহু বিবাহের কথা প্রচলন ছিল। সে সময়ে পুরুষরাই শুধুমাত্র সিংহাসন লাভ করতো তা নয় নারীরাও সিংহাসন লাভ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতো। পুরুষদের মতো নারীদেরও একাধিক পতিগ্রহণের কথা জানা যায়। সে সময়কার নর-নারীরা ঘর-সংসার, বিপুল ঐশ্বর্য, ধন ত্যাগ করে ধর্মীয় ব্যাপারে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতো । শুধু তাই নয়, শিল্প বিদ্যা ও শিক্ষা সম্পর্কেও তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

এমনকি পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও পশুপাখি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত জাতক সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পশুপাখি সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের সঙ্গে পালি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন এবং প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি এবং পশুপাখি সম্পর্কে ধারণা প্রদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম। প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতক সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা সাপেক্ষে সেখান থেকে প্রচুর পর্বত, হিমালয়, নদী, হ্রদ, পাহাড়, জলাশয়, প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পশু, পাখী, বৃক্ষ ও ঋতুর নামোল্লেখ আছে। এটাও প্রতীমান হয়েছে যে, তথাগত ভগবান বুদ্ধ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন জায়ায় যেমন শশ্মান, অরণ্যে, নদীর তীরে হিমালয়ে, বৃক্ষমূলে অর্থাৎ অরণ্যচারী হয়ে বসবাস করতেন। বর্তমান একবিংশ শতকে এসেও যে এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি হচ্ছে এটি আমরা জাতক সাহিত্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তাই বলতে হয় জাতক আমাদের অতি প্রাচীনকাল এবং বর্তমানকাল এই দুই কালের সমন্বয় ঘটাতে সাহায্য করে এবং এই দুই কালের মধ্যে একটি সাজুয্য বন্ধন তৈরী করে। এছাড়া দুই মহাকাল ও সময়কে পর্যবেক্ষণ ও দেখার সুযোগ করে দেয়। এছাড়া উভয় কালের মধ্যে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ তৈরী করে।

সে সময়ে একই সমাজে উচ্চ বর্ণের মানুষ এবং দাস-দাসীও বসবাস করতো। সেসময়ে বড় বড় প্রাসাদ ও শ্রেষ্ঠী ছিল। শ্রেষ্ঠীরা প্রাসাদে বসবাস করতো এবং দাস-দাসী কিংবা চণ্ডালরা সমাজের বিভিন্ন নিম্নস্তরে বসবাস করতো । বর্তমানেও এগুলো প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনকালে বহু ধর্মীয় অনুশাসক ছিল যা বর্তমানকালেও দেখা যায়। শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান কালের মতো বিভিন্ন স্কুল,

Dhaka University Institutional Repository

কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলেও গুরু গৃহে সবাই শিক্ষা লাভ করতো। সেসময়ে সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানকালের মতো সে সময়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, আবৃত্তি, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এছাড়া সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল।

অতএব পাঁচটি অধ্যায় বিশিষ্ট এই অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত সকল বিষয় তথ্য-উপাত্তসহ আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় একটি দিক নির্দেশনামূলক শিক্ষা যেমন পাওয়া যাবে তেমনি বর্ণিত বিষয়ে একটি মৌলিকত্বত্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং বলা যায় বক্তব্য বিষয় এবং গবেষণার সকল দিক সার্থক হয়েছে। আশা করি আগামীতে পাঠক সমাজ এ অভিসন্দর্ভ পাঠে উপকৃত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান ও বিশ্বকোষ

Dictionaties & Encyclopadias Pali-English Dictionary	:	ed.by T.W. Rhys Davids & W. Stede.
Dictionary of Pali Language	:	ed. by R.C. Childers
Dictionary of Pail Proper Names vol. I & II	:	ed. by G.P. Malalasekera
Encyclopaedia of Buddhism	:	do, Ceylon 1961-contd.
Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vil . I & II	:	ed. by Framklin Edgerton
Concise Pali-English Dictionary	:	Buddhadatta Thera, Colombo, Ceylon.
Tibetan-English Dictionary	:	ed. by Sarat Chandra Das

মূলগ্রন্থ (ইংরেজী)

Anguttara-Nikaya,	:	5 vols ; ed. by R. Morris and E. Hardy, London, Pali Text Society 1885-1900.
(The) Anguttara-Nikaya, Anguttara-Nikaya Commentary (Monorathapurani)	:	4 vols ; ed. by Bhikkhu J. Kashyap Nalanda Devanagari Edition, Pali Publication Board, Bihar, India. 1966.
Atthasalini,	:	2 vols; Colombo, Simon Hewavitarne Bequest Series, 1923-31.ed.by E Muller. Pali Text Society London. 1987

Dhaka University Institutional Repository

Apadana	:	2. vols, ed.by M. E. Lilley London, 1925-27.
Apadana Commentary	:	2 parts; colombo, simon Hewavitarne Bequest Series, 1923-31.
(The) Book of Gradual Sayings,	:	5 Vols, ; Eng. trans. by F.L. Woodward (vols. i, ii, v) and E. Hare (Vols. ; iii, iv), ; Pali Text Society, London, 1932-36
The Book of kindred Sayings or Grouped Suttas.	:	5 Vols, ; Eng. trans. by C. A. F. Rhys Davids and F. L. Woodward. Pali Text Society, London. 1917-1930.
Buddha Vamsa	:	ed. by. ; R. Morris, Pali Text Socirety ; London. 1882.
Buddha Vamsa Commetary	:	2 Parts. ; Colombo, Simon Hewavitarne Bequest Series, 1923.
Buddhist Lengends	:	Vols. 28-30, E.W. Burlingame, Cambridge, 1921, London, 1922.
(A) History of Indian Literature;	:	Vol. II, : M. Winternitze, Calcutta University, Calcutta
(A) Analytical Study of Four Nikayas	:	Dr. Dipak Kumar Barua, Rabindra Bharati Uiversity, Calcutt, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

Jataka	:	ed. by Fousboll and Dines Andersem, Pali Text Soiety, London. 1877-1897.
Buddhist India	:	T.W. Rhys Davids, 1933, 1655
Buddhism	:	T.W. Rhys Davids

বাংলা

কথায় ধম্মপদ	ঃ	ড.রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, অভয়তিষ্য প্রকাশনী, বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা, ১৯৬৮।
কোশলের অমর কাহিনী	ঃ	সুগত বংশ মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭ইং।
জাতক মঞ্জরী	ঃ	ঈশান চন্দ্র ঘোষ, কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪ইং।
দীঘ নিকায (শীলস্কন্ধবর্গ)	ঃ	রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির, দুর্যোধন সিরিজ, শ্রী ত্রিপিটক পাব্লিশিং প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৬২ইং।
দীর্ঘ নিকায (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড)	ঃ	ভিক্ষু শীলভদ্র, কলকাতা, মহাবোধি-সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, ১৯৪৭/১৯৫৪/১৯৬১।
প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস	ঃ	হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী অনূদিত) পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ কলকাতা, ১৯৮৯।
বৌদ্ধ সাহিত্য	ঃ	বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫।
ভারতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	ঃ	অতুলচন্দ্র রায়, মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা (জুন) ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

বৃহৎ বঙ্গ	ঃ	দীনেশ চন্দ্র সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১।
বুদ্ধও বৌদ্ধধর্ম	ঃ	অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৯।
বাংলাদেশের ইতিহাস, (১ম খণ্ড)	ঃ	রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা, ১৯৮৮।
বৌদ্ধ ভারত	ঃ	শরৎকুমার রায়, কলকাতা, ১৯৩৯।
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি	ঃ	আশা দাস কলকাতা, বুক হাউস, ১৯৬৯।
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	ঃ	প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।
ধম্মপদ	ঃ	গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬।
পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস	ঃ	বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৯।
পালি সাহিত্যে নারী	ঃ	ড. বানী বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯০।
বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের অবদান	ঃ	অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ১৯৯৩ আবদান।
মহামানব বুদ্ধ	ঃ	অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।
বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব	ঃ	নীহাররঞ্জন রায়, কলকাতা, ১৩৫৬।
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ	ঃ	দীনেশ চন্দ্র সরকার, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮২।
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস	ঃ	তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১।
বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম	ঃ	নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, এ মুখার্জি, ১৩৫৫।
জাতক (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড)	ঃ	ঈশানচন্দ্র ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৫-১৪১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পালি সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড	ঃ	ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।
জাতক সন্দর্শন, প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট	ঃ	সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১।
ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	ঃ	ডঃ সুকোমল বড়ুয়া ও ডঃ সুমন কান্তি বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০।
জাতকের গল্প	ঃ	শ্রী গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ঃ	ড. মণিকুন্তলা হালদার দে, মহাবোধি, বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৬।
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান	ঃ	সুনন্দা বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন	ঃ	করুণা নন্দ ভিক্ষু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।
মিলিন্দ প্রশ্ন	ঃ	পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫।
ভারত ইতিহাস পরিক্রমা	ঃ	অধ্যাপক প্রাভাতাংশু মাইতি, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪।
প্রচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড	ঃ	সুনীল চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৭।
থেরী গাথা	ঃ	বেলু রানী বড়ুয়া, বাংলাদেশ রির্চাস ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য	ঃ	সুকুমার ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহাবর্গ	ঃ	প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ৬/এ নিউ বহু বাজার লেন, কলকাতা, ১৯৩৭।
বৌদ্ধ ভারত	ঃ	বিমল চন্দ্র দত্ত, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৩৮৭।
পালি সাহিত্যে ধম্মপদ	ঃ	ডঃ সুকোমল বড়ুয়া ও ডঃ বেরতপ্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড	ঃ	ডঃ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭।
কোশল ও মার সংযুক্ত	ঃ	ডঃ সুকোমল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

জার্নাল

India Historical Quaterly, Vol. 4, 1928 (IHQ)

Journal of the Oriental Institute of Baroda, Vol. xi, Pt. 3

Journal of Pali and Buddhism Studies, Japan

The Mahabodhi, Vol. 65 May 1957

Journal of the Pali Text Society, London, 1883(JPTS)

Memoris of Archaeological Survey of India (1919).

Journal of Religion and Religions, Vol. 2, 1972

Journal of the Pali Text Society, Vol. 15,1990

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository